দুঃখিনী।

শ্রীজলধর সেন।

মূল্য দশ আনা।

ভূমিকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকের একটু ভূমিকা লিখিবার প্রয়োজন আছে। ১৮৭৫ অব্দে মধ্য-ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা প্রদানের পর আমি এই খানি এবং আর একখানি গল্পপুস্তক লিখি—তখন আমার বয়স ১৫ বৎসর। এঁচড়ে পাকা ছেলে এখন সুলভ হইলেও, ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে নিতান্ত দুর্লভ ছিল না।

আমি এই পুস্তকখানির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ১৯০৬ অব্দের ফাল্গুন মাসে কতকগুলি পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৺ শশধর সেন বি, এ এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রাপ্ত হন এবং আমার এই বাল্য-রচনা কোন প্রকার সংশোধন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন না করিয়াই প্রকাশ করিবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু ঐ বৎসরের ১লা বৈশাখ বসন্তরোগে হঠাৎ তাঁহার দেহাবসান হওয়ায় তিনি তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। রোগের যন্ত্রণায় যখন কাতর, তখনও তিনি একদিন বলিয়াছিলেন "দাদা, বইখানি যেমন আছে তেমনই ছাপাইও, আমি আর পারিলাম না।" একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতার অন্তিমকালের অনুরোধ আমি রক্ষা করিলাম,—'দুঃখিনী' যেমন ছিল তেমন ভাবেই প্রকাশিত হইল। 'জাহ্নবী' সম্পাদক শ্রীমান নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁহার 'জাহ্নবী' পত্রে যদি 'দুঃখিনী' প্রকাশিত না করিতেন তাহা হইলে

এই পুস্তক প্রকাশে এত বিলম্ব হইত না। শ্রীমান নলিনীরঞ্জন আমার সেই সময়ের লিখিত দ্বিতীয় পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপিও খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন।

এই পুস্তকের দোষগুণের জন্য ৩৫ বৎসর পূর্ব্বের জলধর সেন দায়ী—আমি নহি।

সন্তোষ।
১৯০৯।

শ্রীজলধর সেন।

৺ শশধর সেন বি, এ।

ভাই!

পঞ্চদশী বয়সের তুচ্ছ আঁকিবুকি
আমার 'দুঃখিনী';— তাই ছাপাইয়া সুখী
চেয়েছিলে হ'তে ভাই!—হিজি বিজি লেখা
কোথায় পড়িয়া ছিল অযতনে একা,
বিস্মৃত খেয়াল সম। ধূলি ঝাড়ি তার,
তুমিই ত 'দুঃখিনীরে' করিলে উদ্ধার
অপঘাত মৃত্যু হ'তে। পরেরে বাঁচায়ে,
আপনারে ডালি দিলে মরণের পায়ে!
'দুঃখিনী' প্রকাশ হ'ল—তুমি নাই কাছে,
তব স্নেহ ছায়া সম ফিরে তার পাছে।
ভুলিনি অন্তিম সাধ—"দাদা! দুঃখিনীরে
মেজে ঘসে রং দিয়ে এনো না বাহিরে।"
অনাঘ্রাত কুসুমের আদিম সজ্জায়,
সে লুকাবে তোরি বুকে সোহাগে লজ্জায়।

সন্তোষ।
১৯০৯।

শ্রীজলধর সেন।

দুঃখিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্রপুরে রামসত্য ঘোষ নামে একজন মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার সহায়সম্পত্তি বিশেষ কিছু ছিল না; সামান্য জমিজমা ছিল তাহা হইতেই কায়ক্লেশে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। গ্রামের মধ্যে নির্ব্বিরোধ লোক বলিয়া রামসত্যের সুনাম ছিল, এই জন্য মধ্যে মধ্যে গ্রামের জমিদার মহাশয় রামসত্যকে ডাকিয়া লইয়া অনেক বিষয়ে কথোপকথন এবং পরামর্শ করিতেন। তাঁহার সংসারে স্ত্রী, একটী কন্যা, একটী পুত্র এবং তিনি নিজে; বাটীতে চাকর চাকরাণী ছিল না; সমস্ত কার্য্য নিজেরাই করিতেন। বাড়ীতে তিনটী গরু ছিল।

যে বৎসরে রামসত্যের কন্যাটী জন্মে, সে বৎসরে গ্রামে বড় মহামারী উপস্থিত হয় এবং সেই সময়ে রামসত্যের মাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়; এই কারণে রামসত্য কন্যাটীর নাম দুঃখিনী রাখিয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন দুঃখিনীর বয়স পাঁচ ছয় বৎসর এবং রামসত্যের পুত্র রসিকের বয়স তিন বৎসর।

এই সময়ে একদিন রামসত্যের স্ত্রীর জ্বর হইল। গ্রামের

খ্যাতনামা কবিরাজ মহাদেব সেন আসিয়া পানের রস এবং মধু দিয়া কি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু তাহাতে জ্বর আরও বৃদ্ধি হইল; কিছুতেই জ্বরত্যাগ হইল না। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার সময়ে সাধ্বী নিজের পুত্র কন্যাকে অগাধ দুঃখ-সাগরে ভাসাইয়া হরিনাম করিতে করিতে সতীধামে চলিয়া গেলেন।

রামসত্য ঘোর বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না; পুত্রকন্যার লালনপালনের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইলেন। কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া, দিবারাত্রি ছেলেমেয়ে লইয়া বসিয়া থাকিলে দিনান্ন সংস্থান হওয়া কঠিন, অথচ বাটীতেও এমন একটী লোক নাই, যাহার নিকটে শিশু পুত্রকন্যা রাখিয়া যান। রামসত্যের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কুটুম্ব কেহ ছিলেন কি না তাহা আমরা জানি না, থাকিলেও বোধ হয় তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া কেহই এ সময়ে আত্মীয়তা স্বীকার করিতেন না। রামসত্য চিন্তা করিতে লাগিলেন, যদি স্বজাতীয়া একটী স্ত্রীলোক পান। অনেক অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার পিতার একটী পিস্‌তুতো বিধবা ভগ্নী আছেন; আরও অনুসন্ধানে জানিলেন যে, তাঁহার অবস্থা রামসত্যের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়, তাঁহারও অন্ন-সংস্থান নাই। রামসত্য সেই পিসিকে আনিবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেলেন। পিসিও অনেক দিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া এবং পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলেন। পিসির আনন্দিত হইবার অনেক কারণ ছিল; প্রথম তিনি মনে করিলেন—হয়ত রামসত্য তাঁহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে, শেষে মনে করিলেন নিতান্ত পক্ষে

যদি লইয়াও না যায়, তবুও, আমার কষ্টের কথা শুনিলে কিছু না কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা অবশ্যই করিবে। রামসত্য হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া পিসির দাওয়ায় বসিলেন। পিসির সবেমাত্র একখানি ঘর, দাওয়ার এক পার্শ্বেই রন্ধন এবং ঘরের মধ্যে শয়নের স্থান, ঘরে মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুই নাই।

পিসি এক্ষণে আস্তে আস্তে রামসত্যের নিকট আসিয়া বসিলেন এবং রামসত্যকে জিজ্ঞাসা-পড়া করিতে লাগিলেন। তাহার পর পিসি যখন শুনিলেন যে, রামসত্যের স্ত্রী-বিয়োগ হইয়াছে, তখন তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "আজ দাদাই যদি বেঁচে থাক্‌তেন তবে কি আমি আর এ সংবাদ পাই না; তোমরা ছেলে মানুষ। আহা! বউ আমার কত কষ্ট পেয়েই মরেছে। আমার যে কি পোড়া কপাল তা তোমরা বুঝবে কি করে। আমি দিবানিশি তোমাদের কথাই ভাবি, তা তোমরা ত একবার খোঁজও নেবে না যে, বুড়ী আছে না গঙ্গা পেয়েছে। সে কথা এখন থাক্, এখন ছেলে মেয়ের কি ব্যবস্থা করেছ তাই শুনি।"

রাম। সেই জন্যই ত তোমার নিকট এসেছি, তুমি আজই এখনই না গেলে আর আমার সংসার চলে না, আমি ছেলেমেয়ে ল'য়ে মারা যাই।

পিসি। বালাই, ষেঠের বাছা! অমন কথা কি বল্‌তে আছে, তোমার শত্রু যে সে মরুক। আমি বেঁচে থাক্‌তে তোমা-দের কষ্ট হবে!

পিসিও তাহাই চান; বিশেষ যদি রামসত্য আজ একবেলা

থাকেন তাহা হইলে পিসির পক্ষে আহার যোগান বড় কঠিন, কারণ তিনি একটু বেলা হইলে বাহির হইয়া এর বাড়ী এ কাজটুকু ওর বাড়ী ও কাজটুকু করিয়া দেন। কেহ বা দুটো চা'ল দেয়, কেহ বা একটু লবণ দেয়, কেহ বা একটা বেগুন দেয়, তাহাই সংগ্রহ করিয়া দ্বিপ্রহর গত হইলে বাটীতে আসিয়া সে দিনের মত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন; কিন্তু রামসত্যের সহিত একটু কুটুম্বিতা করিবার জন্য বলিলেন—"বল কি, তাও কি হয়, এখন কি যাওয়া হয়; কতদিন পরে এলে, দুটো না খেয়ে গেলে কি হয়।"

কিন্তু রামসত্য কিছুতেই সম্মত না হওয়ায় পিসি আর অধিক জেদ্ করিলেন না এবং তাড়াতাড়ি ঘরের সামান্য জিনিষগুলির একরকম ব্যবস্থা করিয়া, বাড়ীর পাশের গয়লাদের বড় বৌকে তাহার ঘরবাড়ী দেখিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিয়া গেলেন।

পিসির বাটী হইতে মহেন্দ্রপুর প্রায় পাঁচ ক্রোশ। বেলা দুইটার সময়ে তাঁহারা উভয়ে মহেন্দ্রপুরে পৌঁছিলেন। রামসত্য বাটী হইতে যাইবার সময় মেয়েটী এবং ছেলেটীকে এক প্রতিবেশীর বাটীতে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহারা প্রথমে খানিকক্ষণ বেশ চুপ্ করিয়াই ছিল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে যত বেলা বাড়িতে লাগিল, ছেলেটী ততই কাঁদিতে লাগিল। দুঃখিনী একে ছেলে মানুষ, তাহাতে আবার মাতার মৃত্যুতে একরকম হইয়াছিল; সে চুপ্ করিয়া ভাইটীকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইতে চেষ্টা করিল; ছেলেটী আরও কাঁদিতে লাগিল। ছয় বৎসরের বালিকা,

সংসারের কিছুই জানে না, সেও কাঁদিতে আরম্ভ করিল। যে বাড়ীতে রামসত্য তাহাদিগকে রাখিয়া গিয়াছিল, সেটি অধিকারীদের বাড়ী। তাদের একটী মেয়ে আসিয়া উভয়কে সান্ত্বনা করিল এবং ছেলেটীকে কোলে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। তাহার ভাইটী যে কান্না ত্যাগ করিয়া খেলা করিতে লাগিল দুঃখিনী একদৃষ্টে তাহাই দেখিতে লাগিল, বালকটী শান্ত হইলে বলিল, "আয় রসিক! ফুলতলায় যাই, তোকে বড় বড় রাঙ্গা ফুল পেড়ে দেব।"

রসিক আনন্দিত হইয়া, "দিদি, দিদি" বলিয়া তাহার কোলে আসিল। রসিক বড় হৃষ্টপুষ্ট ছেলে, দুঃখিনী বড় রোগা, এইজন্য দুঃখিনী রসিককে বেশীক্ষণ কোলে রাখিতে পারিত না; কিন্তু এখন কায়ক্লেশে কোন প্রকারে রসিককে কোলে লইয়া বাটীর উঠানের নিকট জবাগাছের তলায় আসিল। রসিক তাড়াতাড়ি দিদির কোল হইতে নামিয়াই বলিল "দিদি, এ'টা।" দুঃখিনী সে ফুলটি হাত দিয়া পাড়িয়া দিল। আবার, "দিদি, ঐটা"; সে ফুলটি একটা উপরের ডালে ছিল। দুঃখিনী বলিল, "ওটা যে উঁচুতে রোয়েচে, আমি নাগাল পাবো না।" রসিক তাহা বুঝিল না, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। "তবে আয় আঁক্‌সি আনি"—এই বলিয়া রসিককে লইয়া বাটীর চারিদিক খুঁজিয়া একখানি বড় অথচ হালকা বাঁশ পাইল। "রসিক, তুই এই দিকটা চেপে ধর্" এই বলিয়া সেদিক তাহার কাঁধে তুলিয়া দিয়া আর একদিক নিজে ধরিয়া গাছের দিকে যাইতে লাগিল।

ইতোমধ্যে রামসত্য পিসিকে সঙ্গে লইয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পিতাকে দেখিয়া রসিক ফুলের কথা ভুলিয়া গেল এবং কাঁধ হইতে বাঁশ ফেলিয়া দিয়া "বাবা, বাবা এসেছ" বলিতে বলিতে রামসত্যকে জড়াইয়া ধরিল। দুঃখিনীও যাইয়া বাপের কাছে দাঁড়াইল। কেহই আর পিসির নিকট গেল না। রামসত্য বলিলেন, "দুঃখিনী! তোমার দিদিমা এসেছেন, প্রণাম কর।" দুঃখিনী কথাটি বুঝিল না এবং প্রণামও করিল না, রসিক একবার অপরিচিতার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই দুঃখিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, "ঐ দিদি।" রামসত্য হাসিয়া বলিলেন, "এও, দিদি"; কিন্তু রসিক সে কথা বড় আমলে আনিল না। পিসি আস্তে আস্তে মেয়েটিকে টানিয়া কোলে করিলেন, দুঃখিনী স্বভাবতঃ কিছু শান্ত, সেই জন্য সহজেই পিসির কোলে গেল। কিছুক্ষণ পরে দুঃখিনীকে নামাইয়া দিয়া, পিসি ঘরের মধ্যের সমস্ত দ্রব্য দেখিয়া-শুনিয়া লইতে গেলেন।

রামসত্য মনে করিয়াছিলেন পিসির হাতে গৃহস্থালীর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন। ছেলেমেয়ের কোন প্রকার অযত্ন হইবে না। পিসিরও সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই, সুতরাং পিসি এই সংসারের যাহাতে কল্যাণ হয় তাহারই দিকে মনোনিবেশ করিবেন; কিন্তু দুই চারি দিনেই রামসত্যের ভ্রম ঘুচিল; তিনি পিসির স্বভাব বেশ বুঝিতে পারিলেন, দেখিলেন পিসির তেলটুকু, নুনটুকু বিক্রী করিয়া পয়সা সংগ্রহের অভ্যাস বেশ আছে; পাড়ার লোকেদের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদেও পিসি অনভ্যস্তা নহেন। পিসির আরও একটী গুণ

আছে তাহা আর এখন বলিয়া কাজ নাই। সময় মত পিসিই সে গুণপনা প্রকাশ করিবেন। যাহা হউক রামসত্য অনন্যোপায় হইয়া পিসির অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিলেন। তিনি মনে করিতেন, তবুও ত ছেলেমেয়ে দুবেলা দুটা রাঁধা ভাত পাইতেছে। পিসি না আসিলে যে তাঁহাকে বিব্রত হইতে হইত। মনকে প্রবোধ দিলেন, দশদিন থাকিতে থাকিতেই তাঁহার সংসার পিসির নিজের হইয়া যাইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে পাঁচ ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। এই পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা হয় নাই। দুঃখিনী এবং রসিক তাহাদের দিদিমার নিকটেই থাকে; কিন্তু দিদিমার মুখে তাহারা কোন দিন একটা মিষ্ট কথা শুনিতে পায় নাই। দুঃখিনীর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিরও পরিপক্কতা জন্মিতেছিল, সে রসিক ব্যতীত আর কিছুই বুঝিত না। যখন তাহার দিদিমা রসিককে মারিত, তখন তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে জল পড়িত। দিদিমা স্থানান্তরে গেলেই সে ভাইটীকে সান্ত্বনা করিত, ভাইকে কত কথা বলিত, তাহার গায় হাত বুলাইয়া দিত। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা এই বয়সেই বুঝিয়াছিল যে, সংসারে মা না থাকিলে কত কষ্ট পাইতে হয়। রসিক অনেক সময়ে মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু দুঃখিনী সে কথার বড় একটা জবাব দিত না। রসিক নিতান্ত আব্দার করিলে বলিত, "সকলেরই কি মা থাকে, কাহারও বা মা থাকে, কাহারও বা বাবা থাকে, কাহারও বা দিদি থাকে। দেখ্ দেখি! ও বাড়ীর শ্যামের মা আছে, তার দিদি নাই। তোর দিদি আছে, কাজেই তোর মা নাই। তা তুই দিদি চাস্, না মা চাস্।" রসিক অমনি কাতর হইয়া বলিত, "না না, আমি মা চাই না, দিদি চাই।"

এদিকে রামসত্য দুঃখিনীর বিবাহের জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। দুঃখিনীর যখন আট বৎসর বয়স, তখন হইতেই তিনি বর খুঁজিতে

আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সহায়সম্পত্তি কিছুই না থাকায় এত-দিনের মধ্যেও একটী ভাল ছেলে স্থির করিতে পারেন নাই। অনেক স্থান হইতেই সম্বন্ধ আসিয়াছিল; কিন্তু রামসত্যের অভিপ্রায় ছিল যে, দুঃখিনীকে সৎপাত্রে দান করেন। তাঁহার মনের মত পাত্র না পাওয়ায় তিনি এতদিন দুঃখিনীর বিবাহ দিতে পারেন নাই। বিশেষ দুঃখিনী তাঁহার ঘর ছাড়িয়া যাইবে, এ কথা মনে হইলে তাঁহার প্রাণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি উঠিত। তিনি মনে মনে বলিতেন "মেয়ে এমন কি সেয়ানা হইয়াছে। আরও কিছুদিন থাক্‌না, দুঃখিনী গেলে আমার রসিকের কি হইবে।" কিন্তু তাঁহার পিসি এক্ষণে জাতি যাওয়ার ভয় দেখাইতে লাগিলেন, আরও কত কথা বলিতে লাগিলেন। রামসত্য ভাল মানুষ, বড়ই ব্যাকুল হইলেন। কি করেন, অগত্যা পূর্ব্বে যে সকল পাত্রকে জবাব দিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্য হইতে একটীকেই মনোনীত করিলেন। মহেন্দ্রপুরের সংলগ্ন উদয়পুর গ্রামেই এ পাত্রটির বাড়ী। উদয়পুরকে সাধারণতঃ লোকে ডাদপুর বলিত। পাত্রের নাম ভজহরি মিত্র। পাত্রটি বাঙ্গলা লেখাপড়া বেশ জানিতেন, ইংরাজীও দুই চারিখানি বই পড়িয়াছিলেন; বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসর। ভজহরির বাপ ছিল না কিন্তু অন্যান্য আর সকলেই ছিল। তাহার ছোট তিনটী ভাই এবং দুইটী ভগিনী ছিল। ভজহরি শ্রীহট্টের বন্দোবস্তী আফিসে আমিনের কাজ করিতেন। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। যখন দুঃখিনী শুনিল তাহার বিবাহ হইবে, তখন তাহার আনন্দ হইল না। ছেলেমেয়েরা বিবাহের কথা শুনিলে বাহিরে না হউক

অন্তরে আনন্দিত হয়; কিন্তু দুঃখিনীর আনন্দের পরিবর্ত্তে ভয় ও দুঃখ হইল! সে নিজের বিবাহের কথা ভাবিতে পারিত না, বিবাহের কথা ভাবিলেই তাহার ভ্রাতার কথা মনে পড়িত। এই অল্প বয়সেই দুঃখিনী সংসারের অনেক কথা বুঝিয়াছিল। অবস্থার গুণে একাদশবর্ষীয়া বালিকাও চিন্তা করিতে শিখে, সংসারের সব বোঝে। দুঃখিনী বুঝিত—বিবাহ হইলেই পরের ঘর করিতে হয়, ইহার অধিক সে বুঝিত না; কিন্তু তাহা হইলে রসিককে ফেলিয়া যাইতে হইবে, রসিকের মুখের দিকে তাকাইবার কেহ থাকিবে না। এ কথা যখন দুঃখিনী ভাবিত, তখনই তাহার মনে কষ্ট হইত; সে কাঁদিত। সে ভাবিত আমি ছাড়া রসিকের ক্ষুধার কথা কেহ বুঝিতে পারে না। দিদিমা মারিলে রসিক আমার কাছে আসে; আমি এখানে না থাকিলে রসিক কোথা যাইবে, রসিককে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব। আরও কত কথা দুঃখিনী ভাবিত।

ক্রমেই বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী হইল। রসিকের আনন্দ আরও বাড়িতে লাগিল। বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎও হইত না, এখন তাঁহারাও আসিয়া রামসত্যের বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। কেহ দানসামগ্রীর তালিকা করেন, কেহ আহারের ফর্দ্দ করেন, এ সময়ে সকলেই মুরুব্বি হইয়া বসিলেন। ওপাড়ার ঘোষ মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, রামসত্য তাড়াতাড়ি তামাক সাজিয়া দিলেন। তিনি হুকাটী বামহস্তে ধরিয়া জিনিষের বরাদ্দ দেখিতে লাগিলেন, কোন্ দ্রব্য কম হইল, কোন্ দ্রব্যের আরও প্রয়োজন ইত্যাদি নানাপ্রকার

ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।—"আরে রামসত্য কবে বা ছেলে মেয়ের বিয়ে দিয়েছে যে বুঝবে। আমরা থাকতে যদি তার অসৌষ্ঠব হয় তবে বড়ই দুঃখের কথা।" এই প্রকার অনেক অভিভাবক আসিয়া বাহিরে তামাকের শ্রাদ্ধ এবং ভিতরে খরচের বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

রামসত্য নিরীহ ভালমানুষ ; গ্রামের একটী মহাজনের নিকট হইতে মাত্র তিন শত টাকা খত্ দিয়া ধার লইয়াছিলেন এবং উহারই দ্বারা কোন প্রকারে উপস্থিত কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইবেন মনে করিয়াছিলেন ; কিন্তু পাড়ার মোড়লদের মুরুব্বিগিরিতে অনেক অধিক খরচ হইয়া গেল। যাহা হউক এক প্রকারে বিবাহ-কার্য্য সুসম্পন্ন হইল। দুঃখিনী বিবাহের পর শ্বশুরবাটীতে গেল, বাটীতে রসিক এবং তাহার দিদিমা থাকিলেন। এদিকে বিবাহ শেষ হইলে রামসত্য হিসাব করিয়া দেখিলেন খরচ সর্ব্বশুদ্ধ— ৫৩৪৷৶১০ কাজে কাজেই আরও আড়াই শত টাকা ধার করিতে হইল। রামসত্যকে সত্যপ্রিয় ভালমানুষ জানিয়া মহাজন বিনা বন্ধকেই এত টাকা ধার দিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দুই তিন বৎসরের মধ্যে দুঃখিনী তিন চারিবার শ্বশুরবাটী গিয়াছিল; কিন্তু সে অনেক সময়ই মহেন্দ্রপুরে থাকিত, এখন তাহার বয়স ১৫ বৎসর। রামসত্য সমস্ত দিন কাজ করিয়া সন্ধ্যার সময় ঘরের বারান্দায় মাদুর পাতিয়া শুইতেন, ছেলে এবং মেয়ে কাছে বসিত, তিনি কত রাজার কথা, উপন্যাসের কথা বলিতেন; রসিক শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু দুঃখিনী ঘুমাইত না; কত কথা বাবাকে জিজ্ঞাসা করিত। রামসত্যও সীতার কথা, সাবিত্রীর কথা, দময়ন্তীর কথা বলিতেন; দুঃখিনী শুনিতে শুনিতে অশ্রুত্যাগ করিত, আবার শতমুখে প্রশংসা করিত। রামসত্য নিজের অবস্থার কথাও সময়ে সময়ে দুঃখিনীকে বলিত। দুঃখিনীও বাপের সঙ্গে কত পরামর্শ করিত। আজকালের মেয়ে যেমন বাপের সঙ্গে অলঙ্কারের পরামর্শ করে, ভাল ঢাকাই সাড়ীর পরামর্শ করে; দুঃখিনী সে প্রকারের পরামর্শ করিত না।

একদিনের কথা বলিলেই পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিবেন। একদিন সন্ধ্যার পরে রামসত্য বসিয়া আছেন; কন্যা দুঃখিনী শ্বশুরবাটী হইতে আসিয়াছে; তিনি দুঃখিনীর সহিত কথা কহিতেছেন। এমন সময়ে একজন ভদ্রলোক রামসত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামসত্য দেখিয়াই মহাজনকে চিনিলেন এবং সসম্ভ্রমে বসিতে আসন দিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন —"ঘোষ মহাশয়, টাকাগুলি অনেকদিন হোতে চোল্‌লো, আস্তে

আস্তে শোধ করিতে আরম্ভ করুন; তা নইলে আমার পক্ষে বড় অসুবিধা; আপনিও একযোগে এত টাকা দিতে পারিবেন না।"

রাম। তা ত জানি কিন্তু আমি কোন উপায়ই করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, মহাশয় ভাব্‌বেন না; আমি আপনার টাকা যেমন করিয়াই হউক পারিশোধ করিব।

মহাজন। না তা বোল্‌ছিনে; তবে মাঝে মাঝে মনে কোরে দিতে হয়।

এই প্রকার কথোপথনের পর মহাজন চলিয়া গেল। তখন দুঃখিনী পিতার নিকট অগ্রসর হইয়া বসিল এবং কত টাকা ধার হইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল। রামসত্য বলিলেন—"মা! অনেক টাকা প্রায় ছ-শ।"

দুঃখিনী। ছ-শ! বাবা! এত টাকা কিসে লাগ্‌লো?

রাম। মা! ঘর পেতে বাস কোরতে হোলেই লৌকিকতা রক্ষা কোরতে হয়; দশজন লোককে ডাক্‌তেও হয়। আমি তিন শত টাকার মধ্যেই শেষ করিতে চাহিয়াছিলাম; কিন্তু পাড়ার দশজনের মত গ্রহণ না কোরে তো আর কাজ করিতে পারি না, কাজেই এত লাগিল। তা মা, আমার যদি ধর্ম্মে মতি থাকে, আর গুরু সহায় হন, তবে এ ধার থাক্‌বে না।

দুঃখিনী। বাবা! পাড়ার দশজনের তো আর ধারের জন্য ভাব্‌তে হবে না; কাজেই তারা যা হয়, তা কোরে গেল। আমি হ'লে অত টাকা খরচ কোর্‌তাম না। আমার যা সাধ্য তাই কোর্‌বো; তাতে যদি লোক অসন্তুষ্ট হয় বা লৌকিকতা রক্ষা না হয়, নাই হোল।

রাম। মা! তুমি অত কথা বুঝতে পারবে না; আরও একটু বয়স হোক, দুই একটী ছেলে-মেয়ে হোক, তার পর বুঝবে। এখন আমার দুঃখ দেখে এ কথা বোল্‌ছো।

দুঃখিনী। না বাবা! ছ-শ টাকা ধার করা ভাল হয় নাই। আমি তো শোধের কোন উপায় দেখি না।

রাম। কেন? তুমি দেবে!

দুঃখিনী। আমি কোথা পাব?

রাম। এমন সোনার ঘরে বে দিলাম, তা আমার দুপয়সা .াহায্যও হবে না?

দুঃখিনী নীরব হইল।

রামসত্য পুনরায় বলিতে লাগিল—"তা মা তোমার চিন্তা কি, আমি শীঘ্র মোর্‌বো না, টাকা শোধ হবেই।"

দুঃখিনী এবারে কিছু দুঃখিত হইল এবং বলিল—"আচ্ছা বাবা! তুমি আমাকে বুঝাও দেখি, কেমন কোরে টাকা শোধ হবে।"

রামসত্য কেমন করিয়া বুঝাইবেন? তাঁর কারবার নাই যে টাকা আসিবে! যে কয় বিঘা থামার আছে, তাহাদ্বারা মোটা ভাত, মোটা কাপড় কোন মতে চলে। কাজেই রামসত্য কিছুই বলিতে পারিলেন না; হার মানিলেন।

দুঃখিনী পিতাকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল—"বাবা! আমি তোমার কথাই ভাবি; তুমি দশজনের পরামর্শে যে টাকা ধার কোর্‌লে, এখন তা শোধের তো কোন পথই দেখি না। এদিকে রসিক বড় হোল। ভাল কথা বাবা, রসিককে তুমি স্কুলে

পাঠিয়ে দিলে না। এখন যদি স্কুলে না দাও, তবে সে বিগ্‌ড়ে যাবে?"

রাম। হাঁ, একটী ভাল দিন দেখে, পুরুত ঠাকুরকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তাকে স্কুলে দেব।

দুঃখিনী। কেন একবার ত পুরুতঠাকুরকে দিয়েছ। আবার কেন? আর ইংরেজী পোড়্‌তে যাবে, তার আর দিন লাগে না। আমি ও-বাড়ীর মেয়েদের কাছে শুনেছি, ইংরাজী পোড়্‌তে দিন লাগে না, তাদের ছেলেরা এমনি একদিন স্কুলে গিয়াছিল। সে দিন থেকে রোজ রোজ যায়। আমাদের অবস্থা ভাল না; আর সময় নষ্ট করা ভাল নয়, কালই তুমি ওকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেও।

রামসত্য অগত্যা সম্মত হইলেন, কিন্তু পুরুত ঠাকুরকে কিছু দেওয়া যে দরকার, তাহা তাঁহার মনে তখনও ছিল। পরদিন যথা সময়ে রামসত্য রসিককে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

রামসত্য সেকেলে ধরণে শিক্ষিত, তাই প্রতি কর্ম্মে তাঁহার মনে শুভদিনের আবশ্যকতা, কল্যাণ-কামনায় ব্রাহ্মণকে দানের আবশ্যকতা জাগিয়া উঠে। দুঃখিনীও হিন্দু-কন্যা, হিন্দু ভাবেই পালিতা, তাহার চতুর্দ্দিকেও পাশ্চাত্য ভাবের বিশেষ প্রভাব নাই,—তবু কাল মাহাত্ম্যে অতর্কিত ভাবে তাহার উপর উহার প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। 'ও-বাড়ী'র লোকের কার্য্য তাহার পরিবারের আচার-সম্মত না হইলেও, তাহা যে যুক্তিসঙ্গত—এরূপ ধারণা তাহার হইয়াছে। অনিচ্ছাক্রমে শতসাবধানতার মধ্যেও পরিবর্ত্তন এমনই করিয়া আসিয়া পড়ে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ইতিমধ্যে ভজহরি ১৫ দিনের ছুটী লইয়া বাটিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে স্ত্রীকে কর্ম্মস্থানে লইয়া যান; কারণ বন্দোবস্তী আফিসে ছুটী বড় কম, কাজে কাজেই পরিবার সঙ্গে রাখা কর্ত্তব্য। রামসত্য প্রথমে কন্যাকে এতদূর পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পাড়ার দশজন মত দেওয়ায় তিনি আর অমত করিতে পারিলেন না। কারণ বিবাহের পর যখন সে শ্বশুর-বাটিতে ছিল, তখনও দুই একদিন পরেই রসিককে এবং রামসত্যকে দেখিতে পাইত; কিন্তু এখন সে পথ বন্ধ হইতে চলিল। কতদিনের জন্য যাইতেছে, কোথায় যাইতেছে, আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে কিনা এই সমস্ত চিন্তায় দুঃখিনী বড়ই কাতর হইল। কয়েকদিন পরে ভজহরি নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রমানাথ এবং কাতরা দুঃখিনীকে লইয়া শ্রীহট্ট যাত্রা করিলেন।

সেখানে পৌছিয়া দুঃখিনীর আর কিছুই ভাল লাগিত সর্ব্বদাই কান্না পাইত। ইচ্ছা করিত পাখী হইয়া উড়িতে পারি একবার রসিককে দেখিয়া আসে। রসিক মধ্যে মধ্যে লিখিত। রসিক যতদূর বাঙ্গালা শিখিয়াছিল, তাহাতে সে লিখিতে পারিত, কিন্তু দুঃখিনী পড়িতে জানিত না; রসিকের হা লেখা চিনিত। যখন রসিকের পত্র আসিত তখনই সেই হা লেখা দেখিয়া দুঃখিনী কাঁদিত। রমানাথ তাহাকে পত্র পড়া

শুনাইত। রমানাথের বয়স ২০ বৎসর, সে মোটামুটি ইংরাজীবাঙ্গালা শিখিয়াছিল। তাহার চরিত্র দূষিত হওয়াতে স্কুল ছাড়িয়া বাটীতে বসিয়া দাদার অন্নধ্বংস করিত এবং পাড়ায় ইয়ারকি দিয়া তাসপাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। এইজন্য ভজহরি তাহাকে শ্রীহট্টে লইয়া গেলেন, সেখানে তাহার আফিসের মধ্যে কর্ম্মকাজ শিখিতে বলিলেন।

দুঃখিনীর বড় ইচ্ছা—আপন হাতে পত্র লেখে এবং রসিকের পত্র নিজে পড়িতে পারে। ভজহরি শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি পুস্তক, কাগজ কলম আনিয়া দিলেন, নিজের অবসর কম, এজন্য রমানাথের উপরেই দুঃখিনীর পড়ার ভার দিলেন; কিন্তু এক ঝঞ্চট হইল। দুঃখিনী রমানাথের সহিত কথা বলিত না। সে ভজহরিকে তাহা বলিল; ভজহরি বলিলেন,—"তা রমানাথের সঙ্গে কথা বলিতে দোষ কি, সে তোমার দেবর; তার সঙ্গে কথা বলায় দোষ নাই। বিশেষ তোমার ব্যারাম বা অসুখ হোলে তো আর কেহ কাছে থাকে না, কাহাদ্বারা সেবা চলিবে?" দুঃখিনী রমানাথের সহিত কথা বলিতে বড়ই নারাজ, কিন্তু পড়ার ইচ্ছা বড়ই বলবতী হইল, কাজেই শেষে রাজী হইতে হইল। ভজহরি রাত্রি-কালে অবসর পাইলে পড়া বলিয়া দেন এবং দুঃখিনী যে অল্প সময়ের মধ্যেই পাঠ অভ্যাস করিয়া ফেলে, তাহা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হন। এক একদিন ভজহরি বলেন "তুমি যে তাড়াতাড়ি পড়া আরম্ভ করিয়াছ, এমন করিয়া পড়িলে দুই বৎসর পরে যে আমাদের আফিসের বড় বাবুও তোমার সঙ্গে পারিবেন না।"

দুঃখিনী হাসিত, কোন উত্তর করিত না; কারণ ভজহরিকে দেখিলে তাহার মুখ দিয়া কথা সরিত না; দুঃখিনী আজকালের মেয়েদের মত নহে। ভজহরি দুঃখিনীকে বড় ভালবাসিত। দিনের বেলায় দুঃখিনী রমানাথের নিকট পড়িত কিন্তু কয়েক দিন পরেই রমানাথের নিকট পড়া তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইয়া উঠিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রমানাথের স্বভাব বড় ভাল ছিল না, সেই জন্যই ভজহরি তাহাকে শ্রীহট্টে লইয়া যান। এক্ষণে রমানাথ নিজের কুস্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়ে রমানাথ বেড়াইয়া আসিয়া সহরের নূতন খবর বৌয়ের নিকট বলিত; দুঃখিনীও আগ্রহ-সহকারে শুনিত। রমানাথ ক্রমে যে সমস্ত খবর বলা আরম্ভ করিল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকার হাস্যপরিহাস আরম্ভ করিল তাহা দুঃখিনীর ভাল লাগিল না। দুঃখিনী প্রথম প্রথম রমানাথের ঐ ধরণের বড় একটা কথায় কাণ দিত না। রমানাথ সহরে বাবুদের নিন্দাবাদ করিত, কোন্ বাবুর কয়টী উপপত্নী, কে দেখিতে কেমন তাহা নানাভঙ্গী করিয়া শুনাইত আর তৎসূত্রে দুঃখিনীর সহিত নানা ঠাট্টাতামাসা করিত কিন্তু দুঃখিনী ইহা ভালবাসিত না। রমানাথও ক্রমে বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল, এমন কি দুঃখিনীর নিকট হইতে টানাটানি করিয়া পান কি অন্য দ্রব্য লইত এবং তাহাকে নানাপ্রকারে ব্যতিব্যস্ত করিত। কখনও বা দুঃখিনীর নিদ্রাবস্থাতে তাহার মুখে কালী বা চূণ মাখাইয়া রাখিত। দুঃখিনী মনে করিত, একথা স্বামীকে বলে; কিন্তু পাছে ভজহরি মনে করে যে দুঃখিনী ভ্রাতৃবিচ্ছেদ জন্মাইবার

জন্য একথা বলিতেছে, এই ভয়ে দুঃখিনী ভজহরিকে কিছুই বলিতে পারিত না। একদিন ভজহরি মফঃস্বলে জরিপ করিতে গিয়াছেন; বাটীতে কেবল দুঃখিনী এবং রমানাথ আছে। আজ রমানাথ বড়ই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল; সে যে প্রকার হাসাহাসি আরম্ভ করিল, যে প্রকার ব্যবহার করিল তাহাতে দুঃখিনী আর ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিল না। দুঃখিনী রাগিয়া একেবারে বাঘিনীর ন্যায় হইল, তাহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নি বহির্গত হইতে লাগিল। দুঃখিনী বলিল "দেখ ঠাকুরপো! তোমাকে আমি এতদিন কিছু বলি নাই, কিন্তু আজ বলিতেছি—সাবধান, যদি আজ হইতে আর কখন তুমি আমার সহিত এ প্রকার ব্যবহার কর, তাহা হইলে তোমার ভাল হইবে না। তুমি মনে কর কি? তুমি বুঝি ভাব, তোমার ভাব কেহ বুঝিতে পারে না। তুমি আজ হইতে আমার সহিত সাবধানে কথা বলিবে।" রমানাথ কিছু বিষণ্ণ হইল; এবং মনে মনে রাগও করিল। সে দুঃখিনীকে যে প্রকৃতির মনে করিয়াছিল, তাহা হইতে ভিন্ন প্রকার দেখিল; কিন্তু দুঃখিনীর প্রতি তাহার ভয়ানক রাগ হইল, কিছু না বলিয়া রমানাথ চলিয়া গেল।

পরদিন ভজহরি বাটীতে আসিলেই দুঃখিনী সমস্ত কথা তাহাকে বলিল—আরও বলিল "যদি বাটী হইতে আর কাহাকেও না আন, তাহা হইলে, আমি এখানে মারা যাইব। তুমি মনে করিও না, তোমার সহিত, তোমার ভাইয়ের বিচ্ছেদের জন্য আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। আমি আর যাহাই করি না কেন, মিথ্যা বলি না।" এই বলিয়া দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল। ভজহরি তাহাকে সান্ত্বনা

করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তাহার পরে রমানাথকে আর কিছু না বলিয়া তাহাকে বাটীতে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। রমানাথ যখন শুনিল যে ভজহরি তাহাকে বাটীতে পাঠাইবার সুযোগ খুঁজিতেছে, তখনই বুঝিল যে এ দুঃখিনীর কাজ। কাজেই দুঃখিনীর উপর তাহার রাগ বড় বৃদ্ধি হইল, সে দুঃখিনীকে কষ্ট দিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে আরম্ভ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রমানাথের আর কোন গুণ থাকুক, না থাকুক, লোকের সঙ্গে মিশিতে সে বড় তৎপর। শ্রীহট্টে যাইয়াই নিজের মত চরিত্রের লোকের সঙ্গে তাহার খুব পরিচয় এবং সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কৈলাস নামে একজনের সঙ্গে রমানাথের বড় বন্ধুত্ব হইল। যেদিন শুনিল যে, তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার কথা হইতেছে, সেইদিনই রমানাথ কৈলাসের নিকট উপস্থিত হইল এবং যে যে ঘটনা হইয়াছিল, সমস্ত তাহাকে ভাঙ্গিয়া বলিল। কৈলাস সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল—"হাঁ তাই তো, তবে দেখছি, তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইতেছ।"

রমা। আর কি কোন উপায় নাই?

কৈলাস। তা থাকবে না কেন? তবে কি জান—তুমি ভাল মানুষ, তোমার দ্বারা কিছু হয় না।

রমা। দেখ ভাই! আমাকে তুমি যা বোলবে, তাই করবো, এখান থেকে গেলে আমার চলবে না। দেখ, বাড়ীতে এত সুখে থাকা যায় না। বিশেষ আর কয়েক দিন থাকলেই একটী চাকরীর সম্ভাবনা। চাকরী হইলে আর আমায় পায় কে।

কৈলাস। একটী উপায় আছে। কোন প্রকারে তোমাদের বৌয়ের উপর তোমার দাদার সন্দেহ জন্মাইয়া দিতে পারিলেই হয়। তা হলেই তোমার দাদা তোমাকে আর পাঠাইবেন না।

রমা। সে বড় শক্ত কথা। দাদা বৌকে বড় ভাল জানেন, আর বৌয়ের বিরুদ্ধে কিছু করিলে দাদা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন —এ আমার কাজ।

কৈলাস। আরে আমি যা বলি, তা করলে কেউ জানতে পারবে না। তোমাদের বাড়ীর পাশে যে ডাক্তার বাবু আছে, সে তোমাদের বাড়ীতে প্রায়ই যায়, বৌয়ের ব্যারাম হইলে দেখে শুনে, তোমার দাদাও তাকে খুব বিশ্বাস করেন, তাঁরি সঙ্গে বৌয়ের একটা বদনাম দিয়ে একখানা পত্র লিখিলেই ব'স্।

রমানাথ অনেকক্ষণ চিন্তা করিল। বোধ হয়, তাহার মনের মধ্যে সুমতি ও কুমতি বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিল; কিন্তু অবশেষে কুমতিরই জয় হইল। পাড়ার একজন লোকের দ্বারা ডাক্তার বাবুর জবানি একখানি পত্র বৌয়ের নামে লিখাইয়া লইল এবং সেখানি ডাকে দিয়া আসিল। যথাসময়ে পত্র আসিয়া পৌছিল। পত্রাদি আসিলে বাহিরে চাকরের নিকট থাকে। বাবু বাটীতে আসিলে তিনিই সমস্ত পত্র দেখেন এবং দুঃখিনীর পত্রও নিজে খোলেন। দুঃখিনীর ইহাতে আপত্তি ছিল না, কারণ স্বামীর নিকট হইতে গোপন করিবার তাহার কিছুই ছিল না; কিন্তু সেদিন বাবুর নামে অন্য চিঠি ছিল না, কেবল দুঃখিনীর নামেই একখানি পত্র। রমানাথ চাকরকে পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। চাকর পত্র দেখাইল, রমানাথ বলিল "বৌ বলেছে, যে তাহার পত্র যেন আর বাবুর হাতে না পড়ে; তুই বৌকেই পত্র দিয়া আসিস্"।

অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখিয়া দুঃখিনী ঠিক করিতে পারিল না এ

কাহার পত্র ; কারণ দুঃখিনীর পিতা অথবা রসিক, তাহাকে পত্র লেখে, দুঃখিনী তাহাদের হাতের লেখা চেনে, এ তাহাদের হাতের লেখা নহে। পরক্ষণেই ভাবিল, হয়তো বাবার কোন ব্যারাম হইয়াছে, তাই তিনি নিজ হাতে লিখ্‌তে পারেন নাই, অন্যের দ্বারা লিখাইয়াছেন। এই মনে করিয়া তাড়াতাড়ি পত্র খুলিল ; কিন্তু যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার আত্মা, অস্থির হইয়া পড়িল ; নিজেকে অপবিত্র জ্ঞান করিতে লাগিল ; চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। এ বিষম পত্র কে লিখিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। আমরা সে পত্রে কি ছিল, তাহা সবিশেষ বলিতে চাহি না। তবে এইমাত্র বলিতে পারি, পত্রখানির ভাব বড় কদর্য্য। দুঃখিনী একবার মনে করিল, পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলে ; কিন্তু স্বামীকে না দেখাইয়াই বা ছিঁড়িবে কি প্রকারে, আবার এ প্রকার কুৎসিত পত্রই বা স্বামীকে দেখায় কি প্রকারে ? যদি স্বামী সত্য সত্যই সন্দেহ করেন, যদি স্বামী মনে করেন, পত্রে যে সমস্ত কথা লেখা আছে, সমস্তই সত্য—তাহা হইলে দুঃখিনীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা হইলে দুঃখিনীর জীবন থাকিবে না। শেষে দুঃখিনী স্থির করিল—"স্বামী যাহাই মনে করুন, আমি এ পত্র তাঁহাকে দেখাইব, আমার এ কষ্টের কথা তাঁহাকে না বলিয়া কাহাকে বলিব? কে আমার এমন শত্রু হইল, তিনি হয় তো স্থির করিতে পারিবেন। আর যদি তিনি আমাকে সন্দেহ করেন,—জগদীশ্বর আমাকে রক্ষা করিও। আমার স্বামী যেন অন্য কিছু না ভাবেন। হে হরি ! আমার মনের কথা সব জান। আমার স্বামী যদি একটু কুবিশ্বাস করেন, তবে আমি কোথায় দাঁড়াইব।" দুঃখিনী

অনেকক্ষণ চিন্তা করিল, অনেক ভাবিল এবং নিজে নিজেই বলিতে লাগিল, "যদিই তিনি আমাকে সন্দেহ করেন, তবে এ প্রাণ রাখিব কেন? যে স্ত্রী, স্বামীর সন্দেহ উৎপাদন করিতে পারে, সে স্ত্রীর জীবনের দরকার কি? যে, স্বামীর হৃদয়ের সহিত নিজের হৃদয় মিশাইতে পারে নাই, তাহার বাঁচিবার প্রয়োজন কি?" দুঃখিনী আশ্বস্ত হইল। ভজহরি বাটিতে আসিয়াই দুঃখিনীর মুখ বিষণ্ণ দেখিলেন। দুঃখিনী নিজের কষ্ট ঢাকিবার অনেক চেষ্টা করিল; কিন্তু ঢাকা পড়িল না। দুঃখিনী কাঁদিয়া সমস্ত কথা ভজহরিকে বলিল। ভজহরি নির্ব্বোধ ছিলেন না, তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করি-লেন, অবশেষে স্থির করিলেন, এ কাণ্ড রমানাথের। পরদিন প্রাতঃকালেই ভজহরি, রমানাথকে বাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। রমানাথ, বৌয়ের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া বাটি গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। এ বৎসর পূজার সময় ভজহরি, তিন মাসের বিদায় লইয়া সপরিবারে বাটীতে আসিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত দুঃখিনী নিকটেই ছিল। এ দিকে রসিক গ্রামের কতকগুলি অকর্ম্মণ্য ছেলের দলে প্রবেশ করিয়াছে। লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া এখন কেবল দিবারাত্র আমোদ-আহ্লাদেই সময় কাটায়। নানাপ্রকার কুকার্য্যে তাহার বড়ই আসক্তি। একমাত্র ছেলে বলিয়া রামসত্য বড়ই আদর করিতেন; কাজেই ছেলের এ অবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হইলেন; কিন্তু ছেলেকে কিছুই বলিতে পারেন না। মধ্যে মধ্যে রামসত্য, দুঃখিনীকে রাগ করিয়া পত্র লিখিতেন। দুঃখিনী বেশ বুঝিয়াছিল যে রামসত্যের দোষেই রসিক, এমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। দুঃখিনী বাটীতে আসিয়া, পিত্রালয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় স্বামীকে জানাইল। ভজহরি, দুঃখিনীর কোন কথায় কখনও অমত করেন নাই। দুঃখিনীর ন্যায় সুশীলা এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রী, কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে। ভজহরি, নিজের অদৃষ্টকে ধন্য বলিয়া মানিতেন। দুঃখিনী পিত্রালয়ে যাইয়া দেখেন, এখনো দিদিমা (বাপের পিসী) ঘর আলো করিয়া আছেন। দুঃখিনীকে দেখিয়া রামসত্য বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। কত দুঃখের কথা, কত সুখের কথাই হইল। বৃদ্ধ রামসত্য, রসিকের কথা অনেক বলিলেন, দুঃখিনী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

বিনা বাক্যব্যয়ে সমস্ত শুনিল, কিন্তু অবশেষে থাকিতে না পারিয়া, বলিল :—বাবা! তোমার জন্যই ছোঁড়ার কিছু হইল না।

রা। কেন মা, আমি তার কি করিতেছি।

দুঃ। বাবা! তুমি রাগ কোরো না, মনে কষ্ট কোরো না। তুমি যদি অমন কোরে' আদর না দিতে, তা'হলে কি ও বিগড়ে যায়।

রা। মা! তুমি কি বুঝিবে! যদি ছেলের মা হও, তবে বুঝিবে—সন্তান কি আদরের জিনিস! আমার এমন পোড়া অদৃষ্ট যে, তা বুঝি আর দেখা হয় না।

দুঃ। বাবা! আমি কি ভালবাস্তে বা আদর কোর্তে বারণ করি? তবে কি জান—ছেলে-পিলেকে যেমন আদর কোরতে হবে, তেমনই তাহার লেখাপড়া শিখাবার চেষ্টা কোরতে হবে।

রা। তা তো জানি; কিন্তু মা! আমি বুড়ো মানুষ! ঐ মাত্র একটী সন্তান। কি জানি, কি বোল্‌বো আর বাছা, আবার কোথায় চোলে যাবে। জান না? সেদিন ওপাড়ার হরিশ সেন তার ছেলেকে মেরেছিল; তার আর ঠিকানা নাই। এখন তারা হায় হায় কোরে বেড়াচ্ছে।

দুঃ। তা ছেলে-পিলের এমন চোলে যাওয়া অভ্যাসই বা হবে কেন? আচ্ছা বাবা! আমাকে এবার আর সিলেট যেতে হবে না। তুমি দেখো, আমি রসিককে শোধরাইয়া দিব।

রা। তা বেশ ত। তুমি দেখ—যদি ওকে ভাল করিতে পার। আমি তো মা! অনেক চেষ্টা করেছি।

দুঃ। ও যে এমন কোরে বেড়ায়, মদ গাঁজা খায়, টাকা পায় কোথায় ?

মা। আমি তা কি কোরে জানব। আমার যে অবস্থা, তাতো জানই ; তুমি মাসে মাসে যে কয়টা টাকা পাঠাও, তাতেই কোন রকমে আমি সংসার চালাই। যে জমিটুকু আছে, তার উপর নির্ভর করলে ত সবই হয় ! তা আর ওকে আমি টাকা দেবো কোথা থেকে।

দুঃ। বাবা, দেখ ওর জন্য বড় কষ্ট পেতে হবে। যখন তুমি টাকা পয়সা দাও না, বা ও নিজেও রোজগার করে না, তখন অবশ্যই ওকে চুরি করতে হয়।

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় রসিক, বাটীতে আসিল। সে দুঃখিনীকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং তাহাকে একটি প্রণাম করিল।

রসিক। দিদি ! তুমি কবে সিলেট থেকে এসেছ ?

দুঃ। কেন, তুমি এ খবর রাখ না ? আমি তো বাবাকে পত্র লিখেছিলাম।

রসিক। বাবা ক''দিন বলেছিলেন বটে যে, তুমি বাড়ী আসবে —তা বেশ হোয়েছে। দিদিমার জ্বালায় আর বাড়ীতে থাকা যায় না। আর বাবা তো কেঁদেই বাঁচেন না।

দুঃ। ছি ! রসিক, বাবাকে কি অমন কথা বলতে আছে। তুমি না লেখাপড়া শিখেছ ? পড় নাই,—"পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চ।" যাও, খাওয়া দাওয়া কর গিয়ে।

রসিক ঘরে যাইয়া কাপড় রাখিয়া দিদির উপর রাগ করিতে আরম্ভ করিল। দুঃখিনী রসিকের ভাব দেখিয়া অবাক্! যে রসিককে সে তিন বছরের সময় হইতে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে, মার মৃত্যুর পরে যে রসিককে দিবারাত্রি কত কষ্টে দুঃখিনী পালন করিয়াছে, আজ সেই রসিকের ব্যবহার দেখে' দুঃখিনী, বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। রামসত্য কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন। দুঃখিনী একাকিনী বসিয়া সমস্ত কথা ভাবিতে লাগিল। মায়ের কথা মনে পড়িল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা করিয়া দুঃখিনী স্থির করিল, যেমন করে' হউক রসিককে সুপথে আনিতে হইবে। মনে মনে ভাবিল "কত লোক ভাল হইয়াছে, কত লোক শোধরাইয়াছে। পুরাণে পড়িয়াছি বাল্মীকি মুনি আগে ডাকাত ছিলেন। সে দিন একখানি বাঙ্গালা বহিতে একজন সাহেবের চরিত্রের কথা পোড়েছি। তারা কত খারাপ ছিল, কেউ বা মায়ের নিকট একটি কথা শুনে ভাল হোয়েছে, কেউ বা হঠাৎ একটী কথা শুনে ভাল-হোয়েছে। আর রসিক আমার আপনার মায়ের পেটের ভাই! আমি যদি রসিকের ভ্রম বুঝাইয়া দিই, তাহা হইলে কি সে বুঝিবে না? অবশ্যই তাহাকে বুঝিতে হইবে। দেখি, আমি রসিককে ভাল করিতে পারি কি না।"

এই সমস্ত ভাবিয়া দুঃখিনীর হৃদয়ে বল আসিল; তাহার মন আরও দৃঢ় হইল। তাহার কর্ত্তব্যবুদ্ধি আরও প্রশস্ত হইল। দুঃখিনী এত দিন ধরিয়া যে পড়িয়াছিল—কেমন করিয়া মানুষকে

সৎপথে আনা যায়, কেমন করিয়া মানুষ ধার্ম্মিক হয়—সে সেই সকল কথা পরীক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইল। সে দিন আর সে রসিককে কিছু বলিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার পরে সকলের আহার হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রসিক এখনও বাটীতে আসে নাই। শোবার ঘরের মেজেয় রসিকের আহারের দ্রব্য রাখিয়া দুঃখিনী বসিয়া আছে, ঘরের দুই পাশে দুইখানি চৌকি। একদিকের চৌকির পাশে একটী সেকেলে উঁচু সিন্দুক। রামসত্য একখানি চৌকির উপরে শুইতেন। তাহার পিসি সিন্দুকের উপর শুইতেন এবং অপর দিকের চৌকি রসিকের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু রসিক প্রায়ই বাটীতে থাকিত না। "আজ এতরাত্রি হইয়া গেল তবুও রসিক আসিল না"—এই কথা দুঃখিনী বসিয়া ভাবিতেছে এবং এক একবার দ্বারের দিকে চাহিতেছে। রাস্তায় লোকের পদশব্দ শুনিলেই দুঃখিনী ভাবে—ঐ বুঝি রসিক আস্‌ছে, কিন্তু রসিকের কোন খোঁজ নাই। বৃদ্ধ রামসত্যের নিদ্রা হইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে রামসত্য বলিলেন— "মা! আর রাত্রি জেগে কাজ কি। ভাতগুলি ঢেকে রেখে তুমি শোও।"

দুঃ। না বাবা! আর একটু দেখি।

রাম। তবে যতক্ষণ বোসে থাক্‌বে, ততক্ষণ একখানি পুঁথি পড়।

দুঃ। কি পুঁথি পোড়ব বাবা? কা'ল উদিপুর থেকে একখানা বই এসেছে তাই পড়ি।

রা। কি পুঁথি মা।

দুঃ। সুশীলার উপাখ্যান।

রা। না মা! ও পুঁথি আমার ভাল লাগ্‌বে না। তুমি রামায়ণ কি মহাভারত পড়। যা শুন্‌লে আমার পরকালের কাজ হবে।

দুঃ। বাবা! ভাল কথা শুনলেই পরকালের কাজ হয়।

এই বলিয়া রামসত্যের শিয়রের নিকটস্থ একটী বাক্সের মধ্য হইতে রামায়ণ বাহির করিয়া দুঃখিনী পড়িতে আরম্ভ করিল। দুঃখিনী বাছিয়া বাছিয়া সীতার বনবাস পড়িতে আরম্ভ করিল। বৃদ্ধ স্পন্দহীন হইয়া শুনিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে "আহা" বলিয়া দুই একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। দুঃখিনীও সীতার দুঃখে প্রাণমন ঢালিয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে তাহার চক্ষু দিয়া দরদর ধারে জল পড়িতে লাগিল। পাঠিকাগণ! দুঃখিনীর ন্যায় আপনাদের চক্ষু দিয়া কি জল পড়ে? আপনারা কি এখন রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে পড়িতে সীতার দুঃখে, দময়ন্তী সাবিত্রী-দুঃখে কাঁদিয়া থাকেন? না জামাই-বারিক সধবার একাদশী পড়িয়া আমোদ উপভোগ করেন? বাস্তবিক সমস্ত পৃথিবীতে যাহা আছে, রামায়ণ মহাভারতে তাহা আছে। পাঠিকাগণ, আপনারা একবার অভিনিবেশ সহকারে রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া দেখিবেন। বুঝিতে পারিবেন, নবেল বা নাটক পড়িলে যে কাজ হয়, তাহা অপেক্ষা চতুর্গুণ ফল হইবে। একবার আমাদের দুঃখিনীর ন্যায় সীতার বনবাসের কথা পড়িতে পড়িতে অশ্রুবিসর্জ্জন

করিবেন। পরের দুঃখে সহানুভূতি দেখাইয়া যে কাঁদিতে পারে, সে বাস্তবিকই মানুষ।

দুঃখিনী এক একবার পড়া ত্যাগ করিয়া পিতাকে অন্যান্য দেশের মেয়েমানুষের গুণের কথাও বুঝাইতেছে; রামায়ণের অন্যান্য ভাগের কথাও ঐ প্রসঙ্গে বলিতেছে। সীতার অনুপম চরিত্রের ব্যাখ্যা শত মুখে করিতেছে। এমন সময়ে খট্‌ খট্‌ করিয়া রসিক আসিয়া উপস্থিত হইল। রসিকের হাবভাব দেখিয়াই দুঃখিনী বুঝিতে পারিল যে, রসিক আজ মদ খাইয়া আসিয়াছে। দুঃখিনী মাতালকে বড় ভয় করিত। রসিক আসিয়াই চেঁচামেঁচি আরম্ভ করিল এবং ঘরের মধ্যে মাটীতে বসিয়া নানা প্রকার অশ্রাব্য কথা বলিতে লাগিল, দুঃখিনী কি বলিবে বা করিবে ভাবিয়া পাইল না। সে রসিককে আহারের কথা বলিল, কিন্তু রসিক তাহাতে কর্ণপাত করিল না, বরঞ্চ দুঃখিনীকে সম্পর্কবিরুদ্ধ গালাগালি দিতে লাগিল। দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিল, এ কান্না গালাগালির জন্য নহে, এ কান্না ভাইয়ের অবস্থা চিন্তা করিয়া; তাহার মনে তখনই বৃদ্ধ পিতার কথা উপস্থিত হইল, ঋণের কথা উপস্থিত হইল। রসিক ধীরে ধীরে অবসন্ন হইয়া মাটীতে শয়ন করিল এবং নিদ্রাভিভূত হইল। দুঃখিনী যখন দেখিল যে, রসিক খালি মাটীতেই শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইল, তখন তাহাকে তুলিয়া খাটের উপর শয়ন করাইল এবং নিজে মেজেতে একটী মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল; কিন্তু সমস্ত রাত্রি তাহার নিদ্রা হইল না, সে সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। তাহার মনে নানা প্রকার

ভাবনা হইল। রসিক যে একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল; কি উপায়ে এখন তাহাকে সৎপথে আনিতে পারা যায়, তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। একমাত্র কনিষ্ঠের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সে কাতরা হইল। অনিদ্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে যথাসময়ে সকলেই শয্যাত্যাগ করিল। রসিক শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেদিন আর বেড়াইতে গেল না, অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিছানাতেই শুইয়া থাকিল।

রামসত্যের অবস্থা মন্দ বলিয়া দুঃখিনী আসিবার সময় অনেক জিনিষপত্র লইয়া আসিয়াছিল এবং ভজহরি, মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন, কাজেই যে কয়মাস দুঃখিনী পিতৃগৃহে ছিল, সে কয়মাস তাহার পিতার কোন প্রকার অসুবিধা হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ সংসারে চিরদিন কাহারও এক ভাবে যায় না; আজ যে, অতুল সুখের সাগরে সাঁতার দিতেছে, কাল সে মুষ্টিভিক্ষার জন্য অন্যের দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইতে পারে। জগতে প্রতিদিন এই প্রকার ঘটনা ঘটিতেছে। সংসারের ধন, মান, প্রতিপত্তি পার্থিব সুখ এমনই জলবিম্বের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার নিমেষের মধ্যে কোথায় মিশিয়া যাইতেছে। আমাদের দুঃখিনীর অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। দরিদ্রের সন্তান, অল্প বয়সে মাতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া কত কষ্ট পাইল। রামসত্য কতকগুলি টাকা ধার করিয়াও ভাল ঘরে তাহার বিবাহ দিলেন। দুঃখিনী সুখের মুখ দেখিল; পৃথিবীতে রমণীর সকল রত্নের সার পবিত্র-হৃদয় স্বামিরত্ন পাইয়া সে কৃতার্থ হইল। কিন্তু কে জানিত যে, তাহার জীবনের সুখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, কে জানিত যে এমন সরলা পতিপ্রাণা রমণী অগাধ দুঃখসাগরে পড়িবে? ক্ষুদ্র কীট আমরা,—আমরা কেমন করিয়া বুঝিব যে, সৃষ্টির মহান্ প্রভু এই কার্য্যের দ্বারা কি উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিবেন; আমাদের সাধ্য কি যে, সে কথা বুঝিতে পারি।

পাঠকগণের মনে আছে যে, দুঃখিনীকে বাটীতে রাখিয়া ভজহরি এবার কর্ম্মস্থানে গিয়াছিলেন,—তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দুই চারি মাস পরেই দুঃখিনীকে আপনার নিকট লইয়া যাইবেন; কিন্তু সে

দিন আর আসিল না; দুঃখিনী আর স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিল না। ভজহরির কর্ম্মস্থানে সেবার ভয়ানক ওলাউঠা আরম্ভ হইল। ভজহরি যদি পূর্ব্বে এ সংবাদ দুঃখিনীকে লিখিতেন, তাহা হইলে দুঃখিনী কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিত না। নিশ্চয়ই সে ভজহরিকে বাটীতে আনিবার চেষ্টা করিত; কিন্তু ভজহরি জানিতেন যে, এ সংবাদে দুঃখিনী বড়ই ব্যাকুল হইবে; সেই জন্য তিনি কোন কথাই তাহাকে লেখেন নাই। একদিন ভজহরিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইলেন; ডাক্তারেরা নানা প্রকার চেষ্টা করিলেন, বন্ধু-বান্ধবেরা যত্নের ত্রুটি করিল না, কিন্তু ওলাউঠা হইলে বাঁচা বড় কম লোকের অদৃষ্টেই ঘটে। ১৩ ঘণ্টার মধ্যেই ভজহরির প্রাণ-বিয়োগ হইল। তাঁহার বন্ধুগণ যথারীতি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ করিল। দুঃখিনীর জীবন ঘোর দুঃখসাগরে ডুবিয়া গেল। ভজহরির মৃত্যুর তিন দিন পরেই উদয়পুরে সেই নিদারুণ সংবাদ আসিল। বাটীতে মহা কান্নাকাটি পড়িয়া গেল।

মন্দ সংবাদ বাতাসের অগ্রে চলে; সেই দিন অপরাহ্নেই মহেন্দ্রপুরে রামসত্য শুনিলেন যে, তাঁহার জামাতা ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রামসত্য এই সংবাদ শুনিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দুঃখিনীর মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। কে যেন আসিয়া তাহার মাথার উপরে চাপিয়া বসিল,—তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, —শরীর অবসন্ন হইল; একটী কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না,—নীরবে, ধীরে ধীরে অচৈতন্য অবস্থায় দুঃখিনী ভূমিতে পতিতা হইল। কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞানসঞ্চার হইল, সে চারিদিক্

আঁধার দেখিতে লাগিল; কিন্তু সে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে পারিল না, তাহার বাক্‌শক্তি কে যেন হরণ করিয়া লইয়া গেল। দুঃখিনীর প্রাণের নিদারুণ যন্ত্রণার কথা কি বলিয়া বুঝাইব; ভাষায় শব্দ নাই, যাহাতে সে কথা বলিতে পারা যায়। আমাদের পাঠিকাদিগের মধ্যে যদি এমন হতভাগিনী কেহ থাকেন, কাহারও মস্তকে যদি এমন বজ্রপাত হইয়া থাকে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, দুঃখিনীর সে সময়ের অবস্থা কেমন শোচনীয়। দুঃখিনীর যে আশ্রয়-যষ্টি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে!

রসিক বাটীতে আসিয়া সমস্ত কথা শুনিল এবং দুঃখিত মনে বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। হতভাগিনীর সান্ত্বনার জন্য একটী বার তাহার নিকটে আসিয়া একদণ্ডের জন্যও বসিল না। প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেহ দুঃখিনীকে বুকে করিয়া বসিলেন, কেহ ভজহরির গুণের কথা বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ বা অদৃষ্টের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং দুঃখিনীকে শান্ত করিবার জন্য নানা কথা বলিতে লাগিলেন।

সময়ে সবই সয়। ধীরে ধীরে দুঃখিনী স্বামি-শোক হৃদয়ের মধ্যে চাপিয়া সংসারের কাজ করিতে লাগিলেন। সংসারের কাজ না করিলে বৃদ্ধ পিতাকে কে আহার যোগায়, ভাইয়ের তত্ত্ব কে করে? দুঃখিনী কাজেই দিনে দিনে শান্ত হইতে আরম্ভ করিলেন।

এ শান্তি তাঁহার প্রাণের নহে,—তাঁহার প্রাণ কি আর এ জীবনে শান্ত হইবে? তাঁহার হৃদয়ে এখন রাবণের চিতা দিবানিশি জ্বলিবে; কিন্তু তাহা বলিয়া কি হইবে? দুঃখিনী চিন্তায় আকুল

হইলেন, তিনি চারিদিকে নানা বিপদ্ দেখিতে লাগিলেন। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার চারিদিকে নানা বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! রামসত্যের উপার্জ্জনের ক্ষমতা ছিল না,—অথচ মাসে দশ টাকার কমে সংসার চলিত না, তাহার পরে মহাজনের ঋণ আছে। দুঃখিনীর বিবাহে যে টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহার একটী পয়সাও শোধ হয় নাই,—কোথা হইতে শোধ হইবে? দুঃখিনী মনে করিয়াছিলেন, স্বামীর নিকট হইতে ধীরে ধীরে দুই এক টাকা লইয়া তিনি ঋণ পরিশোধ করিবেন, কিন্তু এতদিন তাহা করিতে পারেন নাই। দুঃখিনী এতদিন দেখিয়াছিলেন, ভজহরি যাহা বেতন পান, তাহাতে তাঁহার সংসার খরচ হইয়া অতি কমই বাঁচে। মাসে মাসে বাটীতে টাকা পাঠাইতেই হইবে। দুঃখিনী কোনদিন একখানি অলঙ্কারের জন্য আব্দার করেন নাই। যখনই ভজহরি দুঃখিনীর কোন অলঙ্কার প্রস্তুতের কথা বলিয়াছেন, তখনই দুঃখিনী সুশীলার (ভজহরির ভগিনীর) বিবাহে অনেক টাকা লাগিবে, তাহার জন্য সঞ্চয় করা দরকার বলিয়া অলঙ্কার গড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। কাজেই এতদিন পিতৃঋণ পরিশোধের কথা তিনি মুখেও আনিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জনের অর্থ অগ্রে তাঁহার নিজ পারিবারিক অভাব মোচন এবং সচ্ছলতার জন্য ব্যয়িত হইবে, তাহার পরে যদি কিছু বাঁচে, তবে তিনি তাহা অন্য ব্যাপারে ব্যয় করিতে পারেন। তবুও দুঃখিনী বাসা খরচের টাকা হইতে ২।১ টাকা বাঁচাইয়া অনেক সময়ে পিতাকে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেন; কিন্তু

একদিনও পারেন নাই, তিনি হয়তো সেই স্থানে কোন দুঃখী দরিদ্রকে দেখিয়া তাহা দান করিতেন। তাঁহার মনে আশা ছিল,—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, তাঁহার স্বামী ধর্ম্মভীরু, সত্যপরায়ণ ব্যক্তি; তাঁহার ক্রমে উন্নতি হইবে এবং যখন তাঁহাদের অবস্থা সচ্ছল হইবে, তখন পিতার ঋণ অনায়াসে শোধ করিতে পারা যাইবে। সেই জন্যই এতদিন ঋণ শোধ হয় নাই। দুঃখিনী যতদিন মহেন্দ্রপুরে ছিলেন, ততদিন ভজহরি মাসে মাসে খরচ পাঠাইতেন;—তাহা না হইলে যে, সংসার চলে না। এখন ধীরে ধীরে দুঃখিনীর সব কথা মনে পড়িল। দেবরের ব্যবহারের কথা মনে পড়িল; সে সংসারে যে তাঁহার স্থান হইবে না, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন; এদিকে পিতার বাটীতে থাকিলেও অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। তাহার পরে ছোট ভাইটীর যে প্রকার চরিত্র, তাহাতে সেই বা কোন্ সময়ে কি করিয়া বসে! নানা চিন্তায় দুঃখিনী অধীর হইয়া পড়িলেন।

ইতোমধ্যে একবার দুঃখিনীকে উদয়পুরে যাইতে হইয়াছিল। সেখানে যথারীতি ভজহরির শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলেই, দুঃখিনী আবার পিত্রালয়ে আসিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

আজ ঘটীটা, কাল বাটীটা, পরশ্ব থালাখানি, এমনই করিয়া এক এক দিন এক একটা জিনিস বিক্রয় করিয়া রামসত্যের সংসার চলিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সামান্য জমিটুকু ছিল, তাহা খাজনার বাকীতে নিলাম হইয়া গিয়াছে। কত কষ্টে যে দিন যাইতেছে, তাহা আর বলিয়া কি হইবে? কিন্তু, দুঃখিনী সে সময়েও একটু একটু উপার্জ্জনের পথ দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি মনে করিলেন, "যে খাইতে পায় না, তাহার আবার লজ্জা কি? শ্বশুর-বাড়ীতে যাইতে পারিব না, সেখানে গেলে মহাবিপদ্। যে প্রকারে হউক, কিছু উপার্জ্জন করিতেই হইবে।" এই সকল কথা চিন্তা করিয়া, তিনি একটা উপায় স্থির করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তিনি জামা সেলাই করিতে শিখিয়াছিলেন; এখন বাজার হইতে কাপড় কিনিয়া আনিয়া, তিনি জামা সেলাই আরম্ভ করিলেন। পাড়ায় একজন লোক, দুঃখিনীকে বড় স্নেহ করিত, সেই লোকটি কাপড় কিনিয়া আনিয়া দিত; দুঃখিনী পীরাণ সেলাই করিয়া আবার তাহার নিকট দিতেন, সে বাজারে বিক্রয় করিয়া সেলায়ের মজুরী আনিয়া দুঃখিনীকে দিত; কিন্তু লোকে জানিতে পারিত না যে, দুঃখিনী সেলায়ের কাজ করিয়া পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু ইহাতে তাঁর মাসে কত হয়? সমস্ত দিনের মধ্যে দুঃখিনী অতি কম সময়ই সেলাই করিতে পারিতেন, তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, পিসী

পূর্ব্বেই মরিয়া পড়িয়াছিল। দুঃখিনীকে একাকিনী সমস্ত কার্য্য করিতে হইত। সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, তাহার পরে প্রায়ই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হয়। এমন সঙ্গতি নাই যে, এক দিনে ৫ কাঠা ধান সংগ্রহ করিয়া ভানিয়া রাখে, কাজেই প্রায় প্রত্যহই ধান ভানিতে হইত। সারা দিন সংসারের কাজে, পিতার শুশ্রূষায় চলিয়া যাইত; ছোট ভাইটীর খোঁজ করিতে হইত। রাত্রিতে পিতা আহার করিয়া বিছানায় বসিলে তাঁহাকে রামায়ণ, কি মহাভারত পড়িয়া শোনাইতে হইত। দুঃখিনী পিতাকে রামায়ণ বা মহাভারত না শোনাইয়া কোন দিনও শয়ন করিতেন না। পিতা যতক্ষণ জাগিয়া থাকিতেন, ততক্ষণ তিনি রামায়ণ পড়িতেন, কোন কোন স্থানে আবার ব্যাখ্যা করিয়া পিতাকে বুঝাইয়া দিতেন এবং মাঝে মাঝে তাঁহাকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। বৃদ্ধ রামসত্য এক একদিন দুঃখিনীর এই ব্যবহার দেখিয়া আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিতেন, তাঁহার প্রাণের মধ্যে যে, কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইত, তাহা কি বলিয়া প্রাকাশ করিব? পিতা নিদ্রিত হইলে এবং ভ্রাতা আহার করিয়া চলিয়া গেলে, দুঃখিনী পীরাণ লইয়া বসিতেন। দুঃখিনী তো তখনও ২৩ বৎসরে পড়ে নাই। অল্পক্ষণ সেলাই করিলে, হয়, তাঁহার প্রদীপের তৈল ফুরাইয়া যাইত, না হয় তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইত। কাজেই ৪।৫ দিনের কমে একটী পীরাণ সেলাই শেষ হইত না; মজুরীও ।০ আনার বেশী পাওয়া যাইত না; কারণ, সেলাই খুব ভাল হইত না। কাজেই ব্যয়-নির্ব্বাহে তাঁহার অতি কষ্ট হইল।

কিন্তু উপায় কি? একমাত্র উপায় রসিক। তিনি প্রতিদিনই রসিককে কত বুঝান; কিন্তু অতি অল্পবয়সেই রসিক একেবারে অধঃপাতে গিয়াছিল। বলিয়াছি, দুঃখিনীর বয়স প্রায় ২৩ বৎসর এবং রসিকের বয়স ১৯ বৎসর। কিন্তু এই বয়সেই সে, সমস্ত কুক্রিয়াতেই দক্ষ হইয়াছে। দুঃখিনীর যদি একটী সন্তান থাকিত, তাহা হইলেও তাহারই মুখের দিকে চাহিতে পারিতেন, কিন্তু এত বয়সেও তাঁহার সন্তান হয় নাই। এখন কাজেই ছোট ভাইকে তিনি তাঁহার জীবনের অবলম্বন মনে করিলেন। শ্বশুরকুলে এক রমানাথ। তাহার পরিচয় আর পাঠকপাঠিকাদিগকে দিতে হইবে না। রমানাথ একজন কু-চরিত্র দলের প্রধান লোক; সে এখন বাটীতে আড্ডা করিয়া বসিয়াছে, কত ভদ্রলোকের সন্তানের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত কুল-স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে। সেইজন্য দুঃখিনী না খাইয়া মরিবেন, তাহাও ভাল মনে করিয়াছিলেন, তবুও শ্বশুরের ঘর আর করিবেন না। কিন্তু রসিক মানুষ না হইলে, আর চলে না। দুঃখিনী এতদিন পর্য্যন্ত রসিকের প্রতি একটীও কর্কশ বাক্যপ্রয়োগ করেন নাই। বরঞ্চ রামসত্য অনেক সময়ে রসিককে গালাগালি দিয়াছেন; কিন্তু দুঃখিনী রামসত্যকে নিষেধ করিয়াছেন। দুঃখিনীর বিশ্বাস, গালাগালিতে লোককে ভাল করিতে পারা যায় না; তাই তিনি ভাল কথা বলিয়া রসিকের মনকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিতেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। মধ্যে একদিন গ্রামে একদল যাত্রাওয়ালা আসিয়াছিল, রসিক নিজে একটু গান গাইতে পারিত এবং যাত্রার অধিকারীর

সহিত একদিন একস্থানে বসিয়া গাঁজা মদ খাইয়াছিল। রতনেই রতন চেনে; রসিক কাহাকেও কিছু না বলিয়া যাত্রাওয়ালার সহিত একদিন চলিয়া গেল। সমস্ত দিনের মধ্যে বাটীতে আসিল না; কিন্তু এ তাহার পক্ষে নূতন ঘটনা নহে। সন্ধ্যার সময় রামসত্য শুনিলেন—রসিক, যাত্রার দলের সহিত চলিয়া গিয়াছে; রামসত্য কাঁদিতে লাগিলেন। দুঃখিনীর বড়ই কষ্ট হইল; যেমনই হউক, তবুও ভাইটী নিকটে ছিল, নিতান্ত বিপদে পড়িলে অবশ্যই ফিরিয়া চাহিত। কিন্তু এটা সামান্য বিপদ্; ইহা অপেক্ষাও আর একটী বিপদ্ আসিয়া দুঃখিনীর স্কন্ধে চাপিয়া পড়িল। রসিকের গৃহ-ত্যাগের কয়েক দিন পরেই রামসত্যের একটু জ্বর হইল। জ্বর অবস্থায় একদিন প্রাতে তাঁহার মুখ দিয়া হঠাৎ প্রায় দেড় পোয়া রক্ত উঠিল এবং তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না। দুঃখিনীর সংসারের শেষ অবলম্বন আজ চলিয়া গেল! আজ এ সংসারে দুঃখিনী আশ্রয়হীনা। তাঁহার আপনার বলিবার যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কেহই জিজ্ঞাসা করেন না। এক আত্মীয় রসিক, সে কোথায় চলিয়া গেল। হায়! আজ পিতার সৎকার কে করে? দুঃখিনার কাঁদিবার অবকাশ কৈ? দুঃখিনী ভাবিল—"আগে পিতার সৎকার করি, তাহার পরে বসিয়া কাঁদিব। আমার কাঁদিবার দিন তো সম্মুখে রহিয়াছে"—এই ভাবিয়া দুঃখিনী প্রতিবেশীদিগের দুই একজনকে তাহার শ্বশুরবাটীতে সংবাদ দিতে পাঠাইয়া দিল; সেখান হইতে সংবাদ পাইবামাত্র রমানাথ আসিল। কিন্তু এক গোলমাল

বাধিয়া উঠিল; রামসত্যের গলা দিয়া রক্ত উঠিয়া মৃত্যু হইয়াছে, শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে, কেহ সৎকার করিতে সম্মত নহেন। দুঃখিনী মহাবিপদে পড়িলেন; কোথায় টাকা পাইবেন? কি করেন, অনন্যোপায় হইয়া রমানাথের শরণাপন্ন হইলেন। রমানাথ অনেক অনুনয়বিনয়ের পর প্রায়শ্চিত্তের খরচ দিতে স্বীকার করিল; যথাবিধি কার্য্য হইয়া রামসত্যের সৎকার হইয়া গেল।

এখন দুঃখিনীর কি হইবে? দিনান্তে দুঃখিনী যথাবিধি পিতার শ্রাদ্ধাদি করিলেন। রসিক তো উপস্থিত নাই, তাহার সংবাদও নাই। একাকিনী দুঃখিনী আর এক ভয়ানক চিন্তায় পড়িলেন। নিজের থাকিবার স্থান কৈ? এই বাটীতে একা বাস করা নিরাপদ নহে। পূর্ব্বে যে প্রতিবেশীর কথা বলিয়াছি, তাহাদের বাটীর মেয়েরা এ কয়দিন আসিয়া দুঃখিনীর সহিত একত্র বাস করিত। কিন্তু পরের মেয়ে ছেলে কয় দিন পরের বাড়ী থাকে? কাজেই দুঃখিনী তাঁহার প্রতিবেশী সেই ভদ্র লোকটীর সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "বাটী বিক্রয় করিয়া যাহা পাও, তাহা দ্বারা কর্জ শোধ দিয়া আমার বাটীতে আসিয়া বাস কর। আমি তোমাকে কন্যার মত দেখিব।" দুঃখিনী এ কথা বুঝিলেন। কিন্তু তাহার মনে আরও অনেক কথা উঠিল। তিনি বলিলেন—"বাবা, বিক্রয় করিলে, কি মহাজনের ঋণ শোধ হইবে?"

প্রতিবেশী। সমস্ত হইবে না, কথঞ্চিৎ তো শোধ হইবে।

দুঃ। কিন্তু বাড়ী বিক্রয় করিব কিরূপে? বাড়ী যে রসিকের। তাহার বাড়ী বিক্রয় করিবার আমার যে অধিকার নাই!

প্রতি। মহাজন যে দুই চারিদিনের মধ্যে নালিশ করিয়া বাড়ী বিক্রয় করিয়া লইবে, তখন কি হইবে? রামসত্যের ঋণের দায়ে তাহার বাড়ী বিক্রয় হইবে। তুমি তাহা আটকাইবে কি দিয়া?

দুঃ। তবে কি রসিক দেশে আসিয়া দাঁড়াইবার স্থান পাইবে না, এই বলিয়া দুঃখিনী কাঁদিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশী তখন এইরূপ বলিতে লাগিলেন :—

"মা! তোমাকে কাঁদাইবার জন্যে এ কথা বলিতেছি না। ভাল কথা বলিতেছি। তোমার বয়স অল্প; এ বয়সে নানা বিপদ্; তোমার একজন মুরুব্বি চাই। সংসারে কত প্রলোভন আছে। শেষে কি জাতি মান সব যাইবে? আমি তোমার পিতার সমান বয়সী, তুমি আমার মেয়ের মত। আমি যাহা বলিতেছি, তাহাই ভাল। তুমি বাটী বিক্রয় করিয়া, আমার বাড়ীতে আসিয়া বাস কর।

এ কথা, দুঃখিনীর মনে ভাল বোধ হইল না। দুঃখিনী সমস্ত পারেন; কিন্তু অন্যের গলগ্রহ হইতে পারেন না। আরও অনেক কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি বলিলেন—"দেখুন, বাড়ী আমি কোন রকমে রাখিতে পারিলেই ভাল হয়। রসিক অবশ্যই দেশে ফিরিবে; জগদীশ্বর তাহার সুমতি দিবেন। তাহার বিবাহ দিয়া আবার আমি সংসার পাতিব। ঐ আশা ছাড়িয়া দিলে যে, আমি বাঁচি না। সে, আমার জীবনে একমাত্র আশা। আর একটী

কথা আছে। আপনি অসম্ভব মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি স্থির করিয়াছি; মহাজনের ঋণ আমি শোধ করিব, অথচ বাটী বেচিব না। আমার শরীরে কি বল নাই? পিতা তো আমার জন্যই ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। যদি আমি শীঘ্র মরিয়া না যাই, তবে এ ঋণ আমি শোধ করিব। যদি বলেন, কেমন করিয়া ঋণ শোধ করিব? তাহা ঠিক করিয়াছি; কিন্তু আপনাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কিছু করিতে পারি না, সেই জন্য আপনাকে বলিতে আসিয়াছি। আপনি আমাকে সাহায্য করুন। আপনি সাহায্য করিলেই, আমি কার্য্য সিদ্ধ করিতে পারিব। আমার চরিত্রের জন্য আপনি ভয় করিবেন না। আমার মাথার উপরে পরমেশ্বর আছেন। আমি অনেক দিন হইতে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আমি কিছুতেই কুপথে যাইব না। আমি মনে করিয়াছি—আমাদের বাটীতে একটি পাঠশালা করিব; আমি যে লেখা পড়া জানি, তাহাতে আমি ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইতে পারিব। আমাদের গ্রামে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আমার এখানে লেখা পড়া শিখিবে। এ কাজ কি মন্দ, এ কি দোষের কাজ? আমার জীবনে ইহা অপেক্ষা ভাল কাজ আর হইতে পারে না। আমি কি এ সংসারে আসিয়া কোন কাজই করিব না! এত দিন তো কষ্টে গেল; যাক্—তাতে আমার দুঃখ নাই; কিন্তু আপনি আমার এই কাজের সহায়তা করিবেন বলুন! আমার জীবন আমি এই কাজে নিযুক্ত করিব। মাথার উপর ভগবান্ আছেন। ইহাতে আমার দুই কাজ হইবে; ছেলে মেয়েদের পড়াইয়া মাসে মাসে

যাহা পাইব, তাহাতে আমার খরচ চলিবে, এবং মহাজনের ঋণও শোধ করিতে পারিব। দেখুন, আমার হাত পা সবই আছে, তবে কেন আপনার গলগ্রহ হইয়া থাকিব? এত দিন কেমন করিয়া সংসার চলিল? আপনি কি আমার এ উপায় মন্দ বলেন?"

প্রতিবেশী রামকৃষ্ণদাস যদিও সেকেলে লোক, কিন্তু লেখা-পড়ার কি ধার ধারেন! তিনি সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, এ জগতে দুঃখিনীর মতন মেয়ে কমই জন্মে। তিনি বলিলেন—"মা! অন্য কেহ তোমার এ কথায় আপত্তি করিতে পারে; কিন্তু মা! মা-দুর্গার আশীর্ব্বাদে আমি বুড়া হইলেও, তোমাদের মত লেখাপড়া জানা লোকের কথা কিছু কিছু বুঝি। আমি সম্মত আছি। আগামী কল্য হইতেই আমি গ্রামের ছেলে-পিলেকে সমস্ত বুঝাইয়া দিব; তাহাদের প্রত্যেকের মাহিয়ানা স্থির করিয়া দিব; কিন্তু মা! একটী কথা তোমাকে রাখিতে হইবে। তুমি প্রতিদিন আমার এখানে আসিয়া আহার করিবে. আমার এখানে রাত্রিতে থাকিবে। তুমি বাটী বিক্রয় করিও না; তাহার যাহা কিছু করিতে হয়, মহাজনকে ডাকিয়া তোমার সম্মুখেই করা যাইবে। তোমার মত বুদ্ধিমতী মেয়ে যে গ্রামে আছে, সে গ্রাম ধন্য।"

দুঃখিনী এ কথা আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। পরদিনই রামকৃষ্ণ, গ্রামের বাটীতে বাটীতে এ সংবাদ দিলেন। সকলেই জানিত, দুঃখিনী বেশ লেখাপড়া জানে। কাজেই কেহ বড়

বেশী আপত্তি করিল না; তবে দুই চারি জন লোক ঠাট্টা-তামাসা করিতে লাগিল। কিন্তু দুঃখিনী সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

দশম পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ দিনের মধ্যেই বৃদ্ধ রামকৃষ্ণের যত্নে প্রথমে পাড়ার ১০।১২টি বালক, দুঃখিনীর বাটীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। দুঃখিনী বড়ঘরের বারান্দায় তাহাদিগকে পড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের কত লোক আসিয়া দুঃখিনীর এই নূতন পাঠশালা দেখিতে আরম্ভ করিল। সকলেই তাঁহার পড়াইবার রীতি এবং তাঁহার সদ্ব্যবহার দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইতে লাগিল। পাড়ার যে লোক, একদিন দুঃখিনীর পাঠশালা দেখিতে আসিত, সেই তাহার পর দিন হইতে নিজের শিশুসন্তানটিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিত।

একদিন গ্রামের সেই মহাজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন অপরাহ্ণ। পাঠশালার ছুটী হইয়াছে; বালকসকল বাটী চলিয়া গিয়াছে। দুঃখিনী বারান্দা পরিষ্কার করিতেছেন। দুঃখিনী যদিও রামকৃষ্ণের বাটীতে বাস করিতেন, তবু প্রায় সমস্ত দিন বাটীতে থাকিতেন, এবং তাঁহাদের বাটী দেখিলে বোধ হইত, যেন মা-লক্ষ্মীর আবাসস্থল। অপরিষ্কার থাকা দুঃখিনীর স্বভাবই নহে। মহাজনকে আসিতে দেখিয়াই দুঃখিনী প্রথমে বসিবার এক খানি সামান্য আসন দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মহাজন লোকটী নিতান্ত মন্দ নহেন; দুঃখিনীর কান্না দেখিয়া তাঁহার মনে একটু দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি বলিলেন, দুঃখিনী! তোমার সমূহ বিপদ্;

সে রসিক ছোঁড়া যদি থাকিত, তাহা হইলেও আশা ছিল। তা দেখ, আমি ন্যায্য টাকা পাইব, আমার টাকাগুলি দেওয়ার উপায় করা, তোমার অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি এত দিন কিছুই বলি নাই; কিন্তু এখন তো টাকা না পাইলে, আর চলে না। আর, রসিক যে মানুষ—সে যদি কোন দিন এই ভদ্রাসন-খানিই বিক্রয় করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমার টাকা সমস্তই মারা যাইবে। তা তুমি আর বাড়ী ঘর লইয়া কি করিবে? একা মানুষ, পেটের ভাত এক রকম চলিয়া যাইবে। আর—তুমি যে দু'দশটা ছেলে পড়াও, তাহাতে যাহা পাইবে, তাহাতেই তোমার বেশ চলিবে। তোমার পিতার এই বাটীখানি বিক্রয় করিয়া লইলে আমার কেবল সিকি টাকা ওয়াশিল হইবে।

দুঃখিনী। আপনি যা বলিলেন, সে কথা ঠিক্; কিন্তু আমি একটী উপায় বলিতেছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে আপনার ঋণ শোধ করিব। রসিক ঋণ শোধ দিতে পারিবে, আমি পারিব না? আমি সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়াছি, আমি সেলায়ের কাজ জানি, আমি না হয় পরের বাড়ী দাসীর কাজ করিব, তাও স্বীকার; কিন্তু বাবার ঋণ আমি কিছুতেই থাকিতে দিব না। আমার জন্যেই বাবা এত টাকা ধার করিয়াছিলেন। আমি এ টাকা শোধ করিব। আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন। আমাকে সময় দিন, আমি ধীরে ধীরে আপনার সমস্ত টাকা শোধ করিব।

মহা। কোথায় পাইবে?

দুঃখিনী।

দুঃখিনী। কেন, আমার শরীর খাটাইয়া পয়সা রোজগার করিব ?

মহা। তবে কি এখন তুমি ভদ্রলোকের মেয়ে হইয়া পরের বাড়ী চাকরী করিবে ?

দুঃখিনী। তাতে দোষ কি ? তবুও তো মনে বুঝিব, আমি পরের গলগ্রহ হই নাই। তবুও আমি আমার বাপের ঋণ শোধ করিতেছি, মনে করিব।

মহা। তায় কি হয়! এই তুমি ছেলে কয়টি পড়াইতেছ, তাহাতেই কত জন কথা বলিতেছে। কেহ কেহ তোমাকে পাগড়ী বাঁধিয়া কাছারীতে যাইতে বলিতেছে।

দুঃখিনী। ও সব কথা শুনিয়া কি করিব ? আপনি একটা কাজ করিবেন। এখন হইতে আমার নিকট আপনি আর সুদ পাইবেন না। আমি আপনার আসল টাকা শোধ করিতে পারি ; কিন্তু মাসে মাসে সুদ দিতে হইলে পারিব না। এই ভিক্ষা আমি আপনার নিকট চাই।

মহা। তবে খৎ-খানিকে বদ্‌লাইয়া দিতে হয়।

দুঃখিনী। দেখুন, আমি খৎ বুঝি না, আপনি যত টাকা পাইবেন, আমাকে কল্য বলিয়া যাইবেন, আমি শোধ করিব। খৎ দিয়া কি হইবে ?

মহা। তবুও একটা লেখাপড়া করিতে হয়।

দুঃখিনী। তা করুন, আমার আপত্তি নাই। তবে রামকৃষ্ণ কাকাকে একবার জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

মহা। মা! তুমি মাসে মাসে কত টাকা দিতে পারিবে? আর, কোথায়ই পাইবে? একটা কথা বলি। ধর্ম্মের দিকে যেন দৃষ্টি থাকে; তুমি ধর্ম্ম নষ্ট করিলে, টাকা পাইব না।

দুঃখিনী শিহরিয়া উঠিলেন, দুঃখিনীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"আপনি তাহা মনে করিবেন না! ভগবান্ আমার সহায়।"

মহা। তবুও বলিতে হয়। আমরা অনেক দেখিয়াছি, শুনিয়াছি। সংসারে তোমাদের নানা আপদ্।

দুঃখিনী। আপনার আশীর্ব্বাদে সে ভয় করি না। আমি মাসে আপনাকে ১০ টাকা দিব; পরে আরও বেশী দিতে পারিব।

মহাজন, মনে মনে দুঃখিনীকে প্রশংসা করিতে করিতে, চলিয়া গেলেন। এদিকে বেলাও শেষ হইল। দুঃখিনী ভাবিতে লাগিলেন, মহাজনকে তো মাসে মাসে দশ টাকা দিব বলিলাম,—এখন এ টাকা কোথায় পাইব! দুঃখিনী চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মহজন চলিয়া গেলেন। দুঃখিনী তখন সেই শূন্য গৃহের দাবায় বসিয়া আকাশপাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার কি অন্ত আছে—জনম-দুঃখিনী দুঃখিনীর জীবন দুঃখময়। তাঁহার যদি নিজের ভাবনাই ভাবিতে হইত তাহা হইলেও কথা ছিল না; ভগবানের রাজ্যে বাঙ্গালী বিধবার একবেলার হবিষ্যান্ন ভাবনার কথা নহে—দুঃখিনী তাহা সংগ্রহ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাঁহার অনন্ত ভাবনা।

প্রথম ভাবনা—রসিক। সংসারে তাঁহার এখন রসিক ব্যতীত আর কেহই ছিল না। আজ যদি রসিক বাড়ীতে থাকিত, তাহা হইলে দুঃখিনী কাহাকে ভয় করেন। সেই রসিক নিরুদ্দেশ। যাহাকে বুকের রক্ত দিয়া মানুষ করিয়াছেন, যাহার জন্য দুঃখিনী প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারেন, সেই রসিক—সেই তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন রসিক কোথায় চলিয়া গেল, বাঁচিয়া আছে কি মারা গিয়াছে তাহাও দুঃখিনী জানিতে পারিলেন না। কতদিন গিয়াছে, কত রাত্রি গিয়াছে, বাহিরে কাহারও পায়ের শব্দ পাইলে দুঃখিনী নিশ্বাস বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া থাকেন—ঐ বুঝি রসিক ডাকিবে—“দিদি”; কিন্তু সেই ‘দিদি’-ডাক দুঃখিনী আজ কতদিন শুনিতে পান নাই। রসিক যদি বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলে তাহার না জানি বিদেশে পরের কাছে কত কষ্ট

হইতেছে ; হয়ত সে অনাহারে কতদিন কাটাইতেছে, হয়ত সে বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় নিশাযাপন করিতেছে। দুঃখিনী আর ভাবিতে পারিলেন না ; তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মস্থান হইতে আকুল ক্রন্দনধ্বনি উঠিতে লাগিল। সেই গোধূলি সময়ে নির্জ্জন গৃহের দাবায় বসিয়া, তিনি দেখিতে লাগিলেন, রসিক যেন মলিন বসনে, শুষ্ক মুখে কোথায় কোন্ দূরদেশে কোন্ অজ্ঞাত পথে চলিতেছে। দুঃখিনী হৃদয়ভেদী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"বাবা !"

কিছুক্ষণ এইভাবেই কাটিয়া গেল। তখন আবার আর এক ভাবনা উপস্থিত হইল—মহাজন। মহাজনকে ত তিনি বলিয়া দিলেন যে, মাসে দশ টাকা করিয়া ঋণ শোধ দিবেন, কিন্তু টাকা কোথায় ? দশটাকা ত দুই চারি পয়সা নয়। মাসে দশ টাকা কোথা হইতে আসিবে ? গ্রামের ছেলেরা যে বেতন দিবে, তাহাতে কি আর মাসে দশ টাকা হইবে ? সকলেই দরিদ্রের সন্তান, দুই আনা এক আনার অধিক বেতন দিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ; বিশেষ তিনি ত আর অধিক শিক্ষা দিতে পারিবেন না, সামান্য ক, খ পড়াইয়া তিনি দুই এক আনার অধিক কি প্রত্যাশা করিতে পারেন ?

তাহার পর তাঁহার এই পাঠশালা চলিবে কিনা কে বলিতে পারে ? তিনি ছেলেদের যদি রীতিমত শিক্ষা দিতে না পারেন, তাহা হইলে দশদিন পরে সকলেই ছেলে ছাড়াইয়া লইয়া যাইবে ; তখন কি হইবে ?

তখন কি হইবে ? এই প্রশ্ন যেন দুঃখিনীর হৃদয়ের মধ্যে

প্রবেশ করিল, তাঁহার মনে হইল, এই প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিবার জন্ম কে যেন প্রস্তুত হইয়াছেন।

তখন কি হইবে? দুঃখিনীর বুকের মধ্য হইতে কে যেন দৃঢ়স্বরে উত্তর করিল,—কে যেন দৈববাণী করিল—"তখন যাহা হইবার হইবে। সে কথা ভাবিবার তুমি কে? তুমি কাজ করিয়া যাও, তখন যাহা হয় আমি ভাবিব।"

বিস্মিতা, বিহ্বলা দুঃখিনীর দুই চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল, দুঃখিনী তখন যুক্তকরে ভক্তিবিনম্র মস্তকে প্রণাম করিলেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিলেন, হে দুর্ব্বলার বল অবলার সহায়, কাঙ্গালের বন্ধু! আমি এতদিন তোমাকে চিনি নাই—এতদিন তোমাকে ভাবি নাই—এতদিন তোমাকে ডাকি নাই। হে দয়াল প্রভু, আজ তুমি আপনা হইতে আসিয়া এই অবলার আঁধার হৃদয়ে আলো জ্বালিয়া দিয়ে—আজ তুমি আমাকে আমিত্ব ভুলাইয়া তোমার সর্ব্বময়ত্বে বিশ্বাস করিতে শিখাইলে। সত্যই ত প্রভু, আমি কে? আমি কতটুকু? তুমি অচিন্ত্য,—অনির্ব্বচনীয়—অনন্ত। তুমি যখন বলিলে আমার ভাবনা তুমি ভাবিবে তখন আমার আর ভাবনা কি? আমার ভাবনা আমি আজ ত্যাগ করিলাম, কিন্তু তোমার ভাবনা আমাকে ভাবিতে শিখাও প্রভু!

এমন সময় রাস্তায় ও-পাড়ার সদানন্দ ক্ষেপা গান ধরিল—

"পাঁচের ঘরে এসে আমি তোমাহারা!
নইলে, তুমি আর আমি অভেদ তারা!"

দুঃখিনী চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইল "তুমি আমি অভেদ তারা!" দিশেহারা হইয়া দুঃখিনী ডাকিলেন —"সদা কাকা!"

সদানন্দের কর্ণে এ ডাক পৌঁছিল, সে উত্তর করিল "যাই মা!"

বলিতে বলিতে সদানন্দ উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরই ঘরের দাবার দিকে চাহিয়া ক্ষেপার নয়ন পলকশূন্য হইল— সে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল!

অল্পক্ষণ চাহিয়াই শিথিলাঙ্গের ন্যায় সদানন্দ সেই উঠানে বসিয়া পড়িল, তাহার পর ভূমিতে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিল। প্রণামান্তে উঠিয়াই করযোড়ে গান ধরিল—

"সদানন্দময়ী হোয়ে গো মা,
নিরানন্দে থেক না।"

দুঃখিনীর তখন সংজ্ঞা হইল; তিনি বলিলেন "ওকি, সদা কাকা, কাকে প্রণাম কোরছো; ও কি বোকৃচো।"

সদানন্দ তখন ও গান ছাড়িয়া দিয়াআবার গান ধরিল—

"বাজীকরের মেয়ে, বলি তোমায় গো;
তুমি এমন কোরে বাজী দেখায়ে,
কত ভুলাবে আমায় গো!"

সদানন্দের তখন কি মনে হইল; সে গান ছাড়িয়া বলিতে লাগিল "মা, তোরে ত চিনেছি! তুই আর ত চাপা দিতে পারলি না মা! এইবার আমি মা পেয়েছি!"

আবার গান—

"তোরা কে দেখ্‌বি রে আয়,
দিন বোয়ে যায়,
সদানন্দ মা পেয়েছে।"

দুঃখিনী সদানন্দের গানে বাধা দিয়া বলিলেন "সদা কাকা, তুমি ও কি আবোল তাবোল বক্‌চো, চল, আমাকে রামকৃষ্ণ কাকার বাড়ীতে রেখে আস্‌বে চল। এই ভর সন্ধ্যার সময় আমার একলা যেতে ভয় করে।"

সদানন্দ আবার গান ধরিল,

"আমার একলা যেতে ভয় করে,
চল গুরু, যাই দু'জন পারে।"

"মা, তোর আবার ভয়! সদানন্দকে ভুলাতে চাস্‌! তোর এই অবোধ ছেলে তোর সঙ্গে পারে যাবে বলে যে আজ আশায় বুক বেঁধেছে। যে ক'দিন এই খেয়া ঘাটে ব'সে থাক্‌তে হবে, সে ক'দিন এই সদানন্দ তোর পাহারায় রইল। তাকে ফেলে তুই পালিয়ে যাবি তা হবে না। আজ যে মায়ে পোয়ে চেনা হয়ে গেছে মা!"

দুঃখিনীকে সন্ধ্যার সময়ও না দেখিয়া রামকৃষ্ণের মেয়ে এই সময় আসিয়া ডাকিল—"দিদি!" তাহার পর উঠানে সদানন্দকে দেখিয়া বলিল, "তাই ত, আমি বলি, এত দেরী কেন, ক্ষেপীর সঙ্গে ক্ষেপা এসে জুটেছে। চল্‌ দিদি, বাড়ী চল্‌; সদা কাকা, আমাদের বাড়ী চল। গান শুনবো।"

"চল্, বেটিরা চল্" বলিয়া সদানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইল। মেয়ে দুইটীকে আগে করিয়া সদানন্দ বাটী হইতে বাহির হইল; রাস্তায় আসিয়াই সে গান ধরিল—

"ধীরে ধীরে চল মা শ্যামা,
আমি যে তোর সঙ্গে যাবো।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখিনীর পাঠশালায় আর ছেলে ধরে না; গ্রামের যত ছোট ছেলে সকলে আসিয়া ঐ পাঠশালায় পড়া আরম্ভ করিয়াছে। গ্রামে যে পুরাতন পাঠশালা ছিল; তাহা উঠিয়া গেল, গুরুমহাশয় স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

দুঃখিনীর পাঠশালা, না চাঁদের হাট। পাঠশালার নাম শুনিলে ছেলেদের গায়ে জ্বর আসিত। সেই মুণ্ডিত-মস্তক গুরুমহাশয়, তাঁহার সেই রক্তনেত্র, তাঁহার সেই দুই হস্ত দীর্ঘ বেত্রযষ্টি, তাঁহার সেই গগনভেদী চীৎকার ও গর্জ্জন। ছেলেরা পাঠশালার কথা মনে করিলে ভয়ে অধীর হইত। আর দুঃখিনীর পাঠশালা,—সে গুরু মহাশয়ও নাই, সে বেতও নাই, সে হাঁক ডাকও নাই—সে সকল কিছুই নাই।

ছেলেরা পাঠশালায় আসিলে, দুঃখিনী কাহাকেও বা কোলে করিয়া আদর করিলেন, কাহাকে বা বুকে চাপিয়া ধরিলেন, কাহারও বা মুখচুম্বন করিলেন। যে ছেলের গায়ে ধূলা লাগিয়াছে, নিজের অঞ্চল দিয়া সেই ধূলা ঝাড়িয়া দিলেন। যে ভাল করিয়া কাপড় পরিতে পারে নাই, তাহার কাপড় খুলিয়া আবার সুন্দর করিয়া পরাইয়া দিলেন! কেহ আসিয়াই বলিল "দিদি, আমি এসেছি।" অমনি দুঃখিনী তাহাকে কোলে তুলিয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী দাদা আমার, সোণার চাঁদ আমার, এসেছে; বেশ বেশ, বই এনেছ। বলত ক, খ, গ।" কেহ আসিয়া বলিল "পিসিমা,

আমি আজ ত্রিশ পর্য্যন্ত গণতে শিখেছি, শুনবে।" অমনি দুঃখিনী তাহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বলত বাবা, উনিশ, কুড়ি, তার পর কি?" বালক অমনি বলিয়া উঠিল "একুশ, বাইশ, তেইশ।"

দুঃখিনীর পাঠশালায় ছোট ছোট ছেলেদের বই ছিল না; পাততাড়ি ছিল না; সব মুখে মুখে। প্রাতঃকাল হইতে আটটা বেলা পর্য্যন্ত দুঃখিনী এই ছোট-ছোট ছেলেদের লইয়া খেলা করিতেন এবং তাহারই মধ্যে বর্ণপরিচয়, বানান, গণিত প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। ছেলেরা বুঝিতেও পারিত না যে, তাহারা পড়িতেছে; তাহারা এ পড়াটীকে খেলারই অন্তর্গত করিয়া লইয়াছিল।

আটটার পরই ছোট ছেলেদের ছুটী হইত; তখন দুঃখিনী অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের ছেলেদের পড়া বলিয়া দিতেন। এই সকল ছেলেরা প্রাতঃকালেই পাঠশালায় আসিত। তাহারা প্রথমে ব্যায়াম করিত; তাহার পর হাত পা ধুইয়া আসিয়া পড়িতে বসিত। ছোট ছেলেরা বিদায় হইয়া গেলে, দুঃখিনী তাহাদের পড়া জিজ্ঞাসা করিতেন, নানা বিষয়ে উপদেশ দিতেন।

পাঠশালা দুই বেলাই বসিত। অপরাহ্ণ কালে পড়াশুনা বন্ধ, তখন ছেলেরা কেবল খেলা করিত; দুঃখিনী তাহাদের খেলা দেখিতেন। খেলা লইয়া তর্ক উপস্থিত হইলে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতেন। কোন কোন দিন কোন ছেলে উচ্চৈঃস্বরে রামায়ণ কি মহাভারত পাঠ করিত, সকলে তাহা শুনিত। কোন-দিন বা দুঃখিনী নিজেই রামায়ণ বা মহাভারতের গল্প বলিতেন;

কবিতা আবৃত্তি করিতেন, কোনদিন বা তিনি নানা প্রকার জীব জন্তুর কথা বলিতেন, নানা দেশের কথা বলিতেন। দুঃখিনী ইংরাজী জানিতেন না; বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যে কয়েকখানি পুস্তক পড়িয়াছিলেন, তাহা হইতেই তিনি উপদেশ দিতেন।

অপরাহ্ণ কালে গ্রামের বৃদ্ধেরা দুঃখিনীর এই পাঠশালায় আসিতেন, তাঁহার এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া তাঁহারা চমৎকৃত হইতেন।

আর ক্ষেপা সদানন্দ,—সে এই পবিত্র বিদ্যা-মন্দিরের ইন্‌স্পেক্টর হইয়াছিল। যতক্ষণ ছেলেরা পড়াশুনা করিত বা লেখা করিত, ততক্ষণ সে তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিত। প্রাতঃ-কাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে এই বিদ্যালয়ের প্রহরীর কার্য্য করিত। কোন্ ছেলে কোথায় গেল, কে কি করিল, সমস্ত সে দেখিত। দশটা বাজিলে ছেলেরা যখন চলিয়া যাইত, তখন সে সমস্ত বাড়ীটা পরিষ্কার করিত; দুঃখিনী তাহাতে বাধা দিলে তাঁহার উপর রাগ করিত, অভিমান করিত। তাহার পর দুঃখিনী যখন বাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়া রামকৃষ্ণের বাড়ীতে স্নান আহারের জন্য যাইতেন, তখন সদানন্দ তাঁহার অনুসরণ করিত। দুঃখিনী রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছিলে, সদানন্দ চীৎকার করিয়া বলিত—"মা, ছুটীই—।" তাহার পর সে এ বাড়ী ও বাড়ী, ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইত তাহাই খাইত; রামকৃষ্ণ বা দুঃখিনী আহার করিতে বলিলে সে খাইত না, বলিত "ভিক্ষার জিনিস না হোলে আমার পেট ভরে না।"

অপরাহ্ণ কালে আবার যথাসময়ে সদানন্দ হাজির! সন্ধ্যার সময় দুঃখিনীকে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সে দুঃখিনীর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত এবং তাঁহার দাবায় শয়ন করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান করিত, তাহার পর নিদ্রিত হইত।

সদানন্দ একটা নূতন গান বাঁধিয়াছিল। অনেকদিন সন্ধ্যার পর সে দুঃখিনীর ঘরের দাবায় একাকী বসিয়া গাহিত—

আমার এ পাঠশালার ছেলেগুলো পড়ে না।
কত কথা বলি—তারা শোনে না।
আমি বলি ওরে তোরা লেখা পড়া কররে,
সাধু-সঙ্গে থাক্ সদা, উপদেশ ধররে,
জ্ঞান উপার্জ্জন কর, আনন্দেতে কাল হর,
ধর্ম্মপথে থাক সদা, কোন কষ্ট হবে না—হবে না।
দু'টি ছেলে ধাড়ি তারা নিজেরা পড়িবে না,
ভাল ছেলে এলে তাদের ঘরে যেতে দেবে না,
সদা করে গোলমাল, শান্ত রয় না ক্ষণকাল,
দিবানিশি বকাবকি ছাড়া তারা রয়না, রবে না।
'সদা' বলে গুরুগিরি করা হোলো বড় দায়,
এই, ছেলে ছটার হাতে পোড়ে প্রাণটা শেষে নাহি যায়;
যে দিয়েছে গুরুগিরি,
কেঁদে তারি পায়ে ধরি,
বোল্‌বো ওগো এ ঝক্‌মারি, আমার দ্বারা হোলো না—হবার না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

এ অধ্যায়টী দুঃখিনীর জীবনচরিতের মধ্যে না দিতে পারিলেই ভাল হইত; এ পরিচ্ছেদে যে কথা বলিতে হইবে, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি কাহারও অদৃষ্টে যেন সে দশা না হয়, কেহ যেন তেমন পরীক্ষায় না পড়েন। দুঃখিনীর জীবন যে কত কষ্টের তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না। দুঃখিনী দুই বেলা স্কুলের কাজ করে, মধ্যাহ্নকালে রামকৃষ্ণের বাটীর প্রায় সমস্ত কাজই করে, রামকৃষ্ণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হন। রামকৃষ্ণ দুঃখিনীকে রাঁধিতে দিতেন না এবং বাটীর সকলকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা যেন দুঃখিনীকে কোন কাজ করিতে না বলে; ভয়, পাছে দুঃখিনী মনে করে সে রামকৃষ্ণের বাটীতে দাসীর ন্যায় রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা বলিতে হয় না, দুঃখিনী নিজেই সব জানেন। দুঃখিনীর ন্যায় গরুর সেবা করিতে কেহ জানে না; দুঃখিনী বাটীর কোন স্থানে জঙ্গল দেখিতে পারেন না; বাটীর ছেলেমেয়েরা অপরিষ্কার হইয়া দুঃখিনীর সম্মুখে যাইতে পারে না। দুঃখিনী আসিবার পূর্ব্বে রামকৃষ্ণের রান্নাঘরের বড়ই বে-বন্দোবস্ত ছিল। রান্নাঘরের এক কোণেই জ্বালানি কাষ্ঠের স্তূপ থাকিত। দুঃখিনী দুই তিনদিন তাহা সরাইবার কথা বলিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন, সে কথায় কেহ বড় মনোযোগ করে না; তখন নিজেই একদিন ঘরের মধ্য হইতে কাষ্ঠ বাহির করিয়া অন্য একস্থানে রাখিলেন, ঘরের মধ্যে

রান্নার স্থানের চারিপাশে নিজে মাটি ঢালিয়া ছোট দেওয়াল গাঁথিতে লাগিলেন, বাটীর বধূরাও দেখিয়াশুনিয়া এই কার্য্যে যোগ দিল। তিনি এমনই সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন যে, সময়ে সময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দে অধীর হইয়া পড়িতেন। যে বাড়ীতে আজ ছেলের ব্যামো, কাল মেয়ের ব্যামো ছিল, সে বাটীতে কিছুই নাই। দুঃখিনীর আগমনে যেন বাড়ীর দুঃখকষ্ট চলিয়া গেল; কিন্তু দুঃখিনীর দুঃখ গেল না।

ইতিপূর্ব্বেই আমরা বলিয়া রাখিয়াছি যে, দুঃখিনীর দেবর রমানাথ এখন দেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ বদ্‌মাইস হইয়া উঠিয়াছে; বাটীতেই আড্ডা করিয়াছে, সেখানে গাঁজা গুলি মদ সব রকমই তাহাদের চলে এবং ইহাই যথেষ্ট নহে, সেইখানে দল বাঁধিয়া বসিয়া তাহারা কত কুলমহিলার সতীত্ব নষ্টের পরামর্শ করে। সেখানে যে সমস্ত কথা হয়, তাহা মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে। সেই 'মুক্তিমণ্ডপে' দুঃখিনীর দুঃখের কথা উঠিল; কত ঠাট্টাতামাসা হইল, কত অন্যায় বাক্য উচ্চারিত হইল; কিন্তু যদি এই হাসি তামাসাই ইহার শেষ ফল হইত, তাহা হইলে আপত্তি ছিল না; জগতে কত জনের অদৃষ্টে কত হাসি তামাসা জুটিয়াছে। কিন্তু তাহাই নহে, বলিতে কষ্ট হয়, সেখানে বসিয়া দুরাত্মা নরপিশাচেরা দুঃখিনীর সতীত্বনাশের আয়োজন করিবার বন্দোবস্ত করিতে লাগিল। রমানাথের পূর্ব্বের আক্রোশ মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার আর একটু আনন্দ হইল যে, এবার দুঃখিনীর পিতার মৃত্যুর সময়ে সে তাহার অনেক সাহায্য করিয়াছে।

মূর্খ মনে করিল সেই কৃতজ্ঞতায় দুঃখিনী তাহার পাপ পথের পথিক হইবে। এ কথাও সে তাহার ইয়ারদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল।

রমানাথ দুই চারি দিন দুঃখিনীর বাটীতে, যাতায়াত করিতে লাগিল; দুঃখিনী রমানথাকে দেখিয়াই জড়সড় হইয়া ঘরের মধ্যে যান; রমানাথ কথা জিজ্ঞাসা করিলে নিজে উত্তর দেন না, যদি সেখানে কেহ থাকে, তবে তাহার দ্বারা উত্তর দেওয়ান, নতুবা কিছুই বলেন না, রমানাথের প্রধান অভিপ্রায় আপাততঃ দুঃখিনীকে নিজ বাটীতে লইয়া যাওয়া; এজন্য সময়ে সময়ে রমানাথ যুক্তি দেখাইতেও ত্রুটী করিত না। যুক্তিগুলি অবশ্যই ভাল, বিধবা দুঃখিনী তাহা বুঝিতেন; দুঃখিনী বুঝিতেন যে, স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম শ্বশুরশাশুড়ীর সেবা এবং তাঁহাদের অভাবে স্বামীর পরিবারের অন্যান্য ব্যক্তির সেবা; কিন্তু যখনই তিনি রমানাথের কথা মনে করিতেন, তখনই শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতেন। মনে করিতেন, সেখানে গেলে তাঁহার সমূহ বিপদ। একদিন রামকৃষ্ণের বড় মেয়ে জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখিনী বলিয়াছিলেন, "দেখ! পৃথিবীতে যাহার স্বামী নাই, তাহার মত হতভাগিনী নাই; কিন্তু স্বামীর মৃত্যুতেই স্ত্রীলোকের সমস্ত কাজ ফুরায় না। অন্যান্য দেশের মেয়েদের সঙ্গে আমাদের একটী বিষয়ে প্রভেদ আছে। আমরা বিলাতের মেয়েদের কথা শুনিয়াছি, তাহারা অনেকগুলিতে একসঙ্গে বাস করে না। এমন কি পিতা উপার্জ্জনক্ষম পুত্রের সঙ্গে একত্র বাস করেন না। ইহাতে

মেয়েরা অনেক কর্ত্তব্য বুঝিতে পারে না, কাজেই স্বামীর মৃত্যুর পরে তাহারা কিছুই কর্ত্তব্য দেখিতে পায় না; তাহারা অবশ্যই আবার সংসার বাঁধিতে বসে। বিশেষ তাহাদের দেশের সমাজের অবস্থা ভাল। আমাদের দেশে তাহা নয়; স্বামীর মৃত্যুর পরে শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন, দেবরভাসুর আছেন, তাঁহাদের সেবা করিতে হইবে, তাঁহাদের কাজ করিতে হইবে, কাজেই আমাদের কাজ ফুরায় না। তবে যে আমি কেন শ্বশুর বাড়ী যাই না, তাহার অনেক কারণ আছে, সেগুলি আর এক সময়ে বলিব।"

এই কথাতেই পাঠকপাঠিকা দুঃখিনীর কথা অনেক বুঝিতে পারিতেছেন; দুঃখিনীর হৃদয়ের অনেক সংবাদ ইহাতে পাওয়া যায়। এমন লক্ষ্মীকে কু-পথে লইয়া যাইবার জন্য হতভাগ্য রমানাথের প্রয়াস।

রমানাথ কিছুতেই দুঃখিনীকে বাটীতে লইয়া যাইবার মত করিতে পারিল না এবং স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধিরও অন্য কোন উপায় দেখিল না। শেষে স্থির হইল, বলপ্রকাশ করিয়া, দুঃখিনীকে তাহারা আড্ডায় লইয়া যাইবে। তিন চারিজন ইয়ারে এই কথা স্থির করিল; কিন্তু দৈবঘটনায় দুঃখিনী একথা শুনিতে পাইলেন। দুঃখিনীর পাঠশালার একটী বালক একদিন নিকটের এক হাটে গিয়াছিল, সেইস্থান হইতে আসিবার সময় সে রমানাথের দলের পাছে পাছে আসিতেছিল এবং তাহারা রাস্তায় আসিতে আসিতে দুঃখিনীর সম্বন্ধে যে সমস্ত আলাপ করিয়াছিল, বালকটী তাহা শুনিয়াছিল। বালকেরা দুঃখিনীকে বড় ভাল বাসিত এবং

ভক্তি করিত। পরদিন পাঠশালায় আসিয়াই বালকটী গোপনে দুঃখিনীকে সমস্ত কথা বলিল। দুঃখিনী সেইদিন হইতে খুব সাবধানে চলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অনেকদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও দুঃখিনী স্বগৃহ ত্যাগ করিয়া রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতেন না, এখন সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই তিনি রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতেন, ভয়, পাছে সন্ধ্যার সময় বদ্‌মায়েসেরা তাঁহাকে রাস্তার মধ্যে অপমান করে বা বলপ্রকাশপূর্ব্বক লইয়া যায়। এমনই ভীতচিত্তে দুঃখিনী দিন কাটাইতে লাগিলেন। অন্য কাহাকেও তিনি একথা বলেন নাই। তবে একজনকে তিনি বলিয়াছিলেন, যাঁহাকে বলিয়াছিলেন তিনি মানুষ নহেন। দুঃখিনী এখন আর মানুষের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। তাঁহার হৃদয় দিনে দিনে এক মহাশক্তির নিকটে অবনত হইতেছিল; তিনি যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহাকে প্রকৃতপক্ষেই উন্নত করিয়াছিল। রামায়ণ মহাভারত পড়িতে পড়িতে তাঁহার প্রাণে মহাশক্তির সঞ্চার হইয়াছিল। দুঃখিনী এখন কথায় কথায় রামায়ণ মহাভারতের কথা চিন্তা করেন, সেই মহাকাব্যের চিত্র এবং চরিত্র সকল দেখিয়া—মনে করিয়া নিজের হৃদয়ে বল পান। যখনই দুঃখিনী সংসারের চিন্তায়,—উপস্থিত বিপদে বিষণ্ণ হইয়াছেন, তখনই কে যেন তাঁহার কর্ণে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস এ জগতে আজ তিনি একাকিনী নহেন, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য একজন আছেন; তাঁহার দুঃখ দেখিবার একজন আছেন। এ বিশ্বাস তাঁহার প্রাণে দৃঢ়বদ্ধ। তাই যখনই কোন

বিপদ্ উপস্থিত হইত, তখনই তিনি একমনে ভগবানকে ডাকিতেন; তিনি ছাড়া বিপদের সময়ে আর কেহ সহায় নাই, ইহা দুঃখিনী জানিতেন। তাই এ বিপদের সময়ে যখন তখনই তিনি ভগবানের নাম করিতেন; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতেন। সত্যসত্যই দুঃখিনী এজগতে মানুষের উপর অতি কম নির্ভর করিতেন; সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত তিনি একাকী নহেন, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, তাঁহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী আর একজন আছে। যাঁহার প্রাণে এত বিশ্বাস, তিনি সহসা ভীত হন না, তাঁহার হৃদয় কোন বিপদ্‌পাতে অধীর হয় না। তাই দুঃখিনী রমানাথের এই কল্পনার কথা শুনিয়া নিজেই সাবধান হইলেন এবং একমনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন।

এমনই করিয়া কয়েক দিন যায়; একদিন বাটী হইতে রামকৃষ্ণের বাটীতে যাইতে একটু রাত্রি হইয়াছে; সদানন্দ সেদিন পাঠশালায় উপস্থিত ছিল না। এমন সময়ে দুঃখিনী সভয়ে দেখিলেন, তাঁহাদের বাড়ীর নিকট দুইটী লোক দাঁড়াইয়া রহিয়াছে; তাহাদিগকে দেখিয়াই দুঃখিনী একটু পশ্চাতে সরিয়া গেলেন, মনে হইল হয়ত রমানাথের দলই তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। সত্যসত্যই তাহারা রমানাথের প্রেরিত দুইটী রাক্ষস। তাহারা দুঃখিনীকে হঠাৎ পশ্চাৎপদ হইতে দেখিয়া দুইজনে দৌড়িয়া দুঃখিনীকে ধরিবার জন্য আসিল। দুঃখিনী তখনি কি করেন, তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে যাইয়া দ্বার বন্ধ করিতে গেলেন; কিন্তু পারিলেন না, দ্বার বন্ধ করিবার পূর্ব্বেই পাষণ্ডেরা আসিয়া উপস্থিত হইল।

দুঃখিনী বুঝিলেন, আজ এই দুর্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে এক ভগবান ব্যতীত আর কেহ তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। অন্যদিন সদানন্দ এ সময়ে কোথাও যায় না, আজ সেও উপস্থিত নাই। তখন দুঃখিনী মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে বল পাইলেন; কেন দৌড়াইয়া ঘরের মধ্যে আসিয়া আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

পাষণ্ডেরা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুঃখিনীকে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইল। দুঃখিনী এক পাও নড়িলেন না; স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সেই সময়ের মূর্ত্তি দেখিয়া নরপিশাচগণও ক্ষণেকের জন্য স্তম্ভিত হইল, তাহারা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

দুঃখিনী একটি কথাও বলিলেন না, বোধ হয় তখন তাঁহার কথা বলিবার সামর্থ্যও ছিল না। সতীর তেজ তাঁহাকে শক্তিশালিনী করিয়াছিল, তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হয়, কাহার সাধ্য।

দুঃখিনী স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া একবার কেবল দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দ্বার দেখাইয়া দিলেন, একটি কথাও বলিলেন না। যাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল, তাহারা তখন কি করিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না।

একটু পরেই রমানাথের কথা সরিল, সে কঠোর স্বরে বলিল "বৌদিদি, তোমার কেউ নাই; আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। আজ তোমাকে লইয়া যাইব-ই, কে ঠেকায় দেখিব" বলিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইল।

দুঃখিনী এই আকস্মিক বিপৎপাতে শঙ্কিতা হইলেন না। দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া স্থির উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি রমানাথের মুখের উপর স্থাপিত করিলেন। সে চক্ষু হইতে যেন বিদ্যুজ্জ্বালা বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। দেখিয়া পিশাচের হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

সহসা রমানাথ চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকারে দুঃখিনীর চমক ভাঙ্গিল; তিনি দেখিলেন—সম্মুখে সদানন্দ! সদানন্দ রমানাথের গলা টিপিয়া ধরিয়াছে।

এই ব্যাপার দেখিয়া রমানাথের সঙ্গীরা যে যে দিকে পাইল, পলায়ন করিল। রমানাথ চীৎকার করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সদানন্দ তাহার গলা এমন জোরে ধরিয়াছিল যে, তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না।

সদানন্দ এতক্ষণ কথা বলে নাই; যখন সে দেখিল রমানাথের সঙ্গীরা পলায়ন করিয়াছে, তখন সে বলিল—"মা।"

দুঃখিনী সদানন্দের কথা বুঝিলেন; প্রাণের অন্তরালে যে কি কথা আছে তাহা আর তাঁহাকে বলিতে হইল না, তিনি বলিলেন —"সদানন্দ, ওকে ছেড়ে দাও।"

সদানন্দ আবার বলিল—"মা!" তাহার মুখ দিয়া অন্য কথা বাহির হইল না। দুঃখিনী তখন বলিলেন "সদা-কাকা, তুমি আমি শাস্তি দিবার কে? উপরে একজন আছেন, তা কি ভুলে গেলে সদা-কাকা।"

সদানন্দ আর কথাটি বলিল না, ধীরে ধীরে রমানাথের গলা ছাড়িয়া দিল। রমানাথ তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সদানন্দ তখন মাটীর উপর বসিয়া পড়িল; সে যেন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। রমানাথের স্তায় বলবান যুবককে আটক করিবার জন্য সে তাহার শরীরের সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াছিল।

দুঃখিনী তাড়াতাড়ি সদানন্দের নিকট গেলেন। তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। সদানন্দ আর স্থির থাকিতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল স্বয়ং মা ভবানী তাহার শরীরে স্নেহ-হস্ত সঞ্চালিত করিতেছেন। সে তখন করযোড়ে গান ধরিল—

মা, মা, বোলে আর ডাকবো না।
শ্যামা, দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা।"

দুঃখিনী গানে বাধা দিয়া বলিলেন "সদা-কাকা চল, বাড়ী যাই।"

সদানন্দ তখন গান ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুইজনে ঘরের বাহির হইল, দুঃখিনী ঘরের তালা বন্ধ করিলেন।

তাহার পর দুঃখিনী আগে আগে চলিলেন, সদানন্দ পশ্চাতে পশ্চাতে চলিল। কিন্তু সে ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, রাস্তায় যাইয়াই আবার গান ধরিল—

আয় দেখি মন চুরি করি;
ওরে, তোমায় আমায় একত্র রে;
শিবের সর্ব্বস্বধন শ্যামা-চরণ
যদি আনতে পারি হ'রে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

এ দিকে দিনে দিনে দুঃখিনীর স্কুলে বালক এবং বালিকার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। প্রথম প্রথম কেহ বালিকা পাঠাইত না; কিন্তু দুঃখিনী প্রত্যেক বাড়ীতে যাইয়া বালিকা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। দুঃখিনীর চরিত্র সকলেই জানিতেন, ক্রমে ক্রমে অনেক বালিকা স্কুলে আসিল। প্রাতঃকালে এবং অপরাহ্ণকালে বালকেরা পড়িতে আসিত, বালিকারা মধ্যাহ্নকালে পড়িতে আসিত। দুঃখিনী নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বালক বালিকারা যে কেবল বই পড়িতে শিখিবে, তাহা দুঃখিনীর অভিপ্রেত নহে। বালকদিগের মধ্যে অনেকেই কৃষকের ছেলে,— তাহারা যাহাতে বাবু হইয়া না যায় দুঃখিনী এমন ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। দুঃখিনী নিজে হিসাব পত্র খুব ভাল জানিতেন না, যাহা জানিতেন বালকদিগকে তাহা শিখাইতেন। কিন্তু দুঃখিনী একটী কার্য্য করিয়া বালকদিগের বিশেষ উন্নতি করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণকালে বালকেরা আসিলে দুঃখিনী তাহাদিগকে বই পড়িতে দিতেন না। সে সময়ে দুঃখিনী তাহাদিগকে হিসাব, নামতা এবং সহজ সহজ পদ্য মুখে মুখে শিখাইতেন এবং নানাপ্রকার উপদেশপূর্ণ গল্প বলিতেন, তাঁহার নিকট হইতে গল্প শুনিবার জন্য বালিকারা পর্য্যন্ত ছুটীর পরে বসিয়া থাকিত; বালিকারা কেহ হয় ত হাঁ করিয়া বসিয়া গল্প শুনিত কেহ বা সেলাই করিত আর গল্প শুনিত;

—বালকেরা এক পার্শ্বে বসিয়া গল্প শুনিত। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই বালিকারা বাটীতে চলিয়া যাইত; তখন দুঃখিনী বালকদিগকে আর এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেন। দুঃখিনীর বাটীতে অনেকখানি জমি ছিল। দুঃখিনী সেই জমি বালকদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বালকেরা ৩।৪ জনে এক এক ভাগ জমি লইয়াছিল। প্রত্যেক বালক বাটী হইতে এক একখানি কোদালী আনিয়া দুঃখিনীর বাড়ীতে রাখিয়াছিল। প্রায়ই দৈর্ঘ্যে দশ হাত, প্রস্থে দশ হাত করিয়া এক এক খণ্ড জমি এক একদল বালকের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। ৩।৪টী বালকের এক এক খণ্ড জমি ছিল। বালকেরা সন্ধ্যার পূর্ব্বেই কোদালী লইয়া জমিতে যাইত; তাহারা নির্দ্দিষ্ট জমিতে মাটী প্রস্তুত করিত। এই আমোদ দেখিবার জন্য সন্ধ্যায় সময় কত লোক দুঃখিনীর বাটীতে আসিত। সকলেই চাষার ছেলে; চাষাদের বিশ্বাস ছিল, ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখিলে বাবু হইয়া যায়, দুঃখিনী সে বিশ্বাস নষ্ট করিবার জন্য এই উপায় করিয়াছিলেন। উহাতে বালকদিগের শরীরও খুব সবল হইত। বড় বড় বালকেরা মাটী কাটিত এবং চাপ ভাঙ্গিত, ছোট বালকেরা ঘাস বাছিত। আর দেবী দুঃখিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া এই সকল কার্য্য দেখিতেন; যাহাদের একটু অধিক পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত, তিনি তাহাদের কার্য্যের সাহায্য করিতেন। মাটী ঠিক হইলে, চাষারাই নানা প্রকার বীজ আনিয়া দিত, বালকেরা সেই সমস্ত বীজ জমিতে বপন করিত। ইহার পরে দুঃখিনীকে একটু বেশী খাটিতে হইত। দুঃখিনী

কূপ হইতে জল তুলিয়া দিতেন, আর বালকেরা সেই জল বহিয়া লইয়া জমিতে দিত। দুঃখিনীর বাগান গ্রামের মধ্যে একটা দেখিবার জিনিস হইয়াছিল।

এই প্রকারে প্রায় ৪।৫ মাস গেল। এই চার পাঁচ মাসের মধ্যে দুঃখিনীর নাম গ্রামের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া উঠিল। দুঃখিনী আরও একটী কাজ করিতেন; মধ্যে মধ্যে মহোৎসবের আয়োজন করিতেন। বাগানে বেশ আয় হইতে লাগিল। দুঃখিনীর ইচ্ছা যে সে সমস্তই বালকবালিকাদিগের জন্য ব্যয় করেন; তাহারা মাহিয়ানা বাবদে যাহা দেয় তাহাই নিজে গ্রহণ করেন; কিন্তু বালকদিগের অভিভাবকেরা তাহাতে সম্মত নহেন। তাঁহারা সমস্তই দুঃখিনীকে লইতে বলেন।—গ্রামের মধ্যে যে, যে ভাল জিনিস পাইত, তখনই তাহা দুঃখিনীকে আনিয়া দিত; দুঃখিনীকে না দিয়া বালকবালিকারা কিছুই খাইতে পারিত না। দুঃখিনী এখন দেখিলেন যে, তাঁহার বেশ আয় হইতে লাগিল। বাটীতে যত তরকারী এবং অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহা তিনি বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইয়া দিতেন। এই সব দ্রব্য বিক্রয় করিয়া মাসে প্রায় ২৫।৩০৲ টাকা হইতে লাগিল; ইহা ব্যতীত বেতন আছে। দুঃখিনী মহাজনের টাকা শোধের উপায় করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইলেন। তিনি প্রতি মাসে মহাজনকে ৩০৲ টাকা করিয়া দিতে লাগিলেন। মহাজন দুঃখিনীর গুণে এত মোহিত হইয়াছিলেন, যে তিনি সুদের টাকা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন।

এদিকে গ্রামের ভদ্রলোকেরা দুঃখিনীর এই গুণের কথা জেলার উপরে যাইয়া যাহার তাহার নিকট গল্প করিত। মহেন্দ্রপুর হইতে যে লোক জেলায় যাইত সেই দুঃখিনীর কথা বলিত। এই সমস্ত কথা শুনিয়া, ডিপুটী বাবু এবং স্কুলের সবইনেস্পেক্টর বাবু একদিন মহেন্দ্রপুর আসিবেন বলিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্রপুরের লোকেরা সবডিবিজনকেই জেলা বলিত। গ্রামের সকলেই শুনিল যে, ডিপুটীবাবু এবং স্কুলের বাবু দুঃখিনীকে খেতাব দিতে আসিবেন। দুঃখিনী এই কথা শুনিয়া একেবারে লজ্জায় মরিয়া গেলেন। গ্রামের লোকের সম্মুখে যাহা হয় তিনি করিতে পারেন ; ইহারা বড় লোক, হাকিম, তাঁহাদের সম্মুখে তিনি কেমন করিয়া বাহির হইবেন। কিন্তু উপায় নাই।

রামকৃষ্ণের বাটীতে যথাসময়ে বাবুরা আসিলেন। তাঁহারা যে সময়ে পৌঁছিলেন তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই সে দিন আর স্কুল দেখা হইল না। রামকৃষ্ণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের আহারাদির আয়োজন করিতে লাগিলেন ; গ্রামের চৌকিদার রামকৃষ্ণের বাটীতে মোতাইন থাকিল। রাত্রিতে ডেপুটী এবং ইনেস্পেক্টর বাবু রামকৃষ্ণের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

পরদিন, প্রাতঃকালে সকলে মিলিয়া দুঃখিনীর বাটীতে গেলেন, তাঁহারা যাইয়া দেখেন, বালকেরা বড় ঘরের বারান্দায় এবং ঘরের মধ্যে চাটাই পাতিয়া বসিয়া পড়া-শুনা করিতেছে। দুঃখিনী তাঁহা-দিগকে বাটীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই, একটু জড়সড় হইয়া

এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। তাঁহারা ঘরে আসিবেন কি, বাহিরে বাগানে যে কাণ্ড দেখিলেন, তাহাতেই তাঁহারা অবাক্ হইয়া গেলেন। সমস্ত বাগান ঘুরিয়া তাঁহারা ঘরে আসিলেন।

ডেপুটী বাবুর বয়স প্রায় ৫০ বৎসর হইবে; সবইন্‌স্পেক্টরবাবুর বয়সও প্রায় ৪০ বৎসর। তাঁহারা ঘরের ভিতরে আসিয়া দুই জনে দুইখানি টুলের উপর বসিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা দুঃখিনীর সঙ্গে কথা বলেন। প্রথমে বালকদিগকে পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। এ সময়ে দুঃখিনীকে উপস্থিত হইতে হইল। দুঃখিনী পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন, বাবুরা উভয়েই ব্রাহ্মণ। রামকৃষ্ণ দুঃখিনীর হাত ধরিয়া আনিলেন, এবং দুঃখিনী সম্মুখে আসিয়া উভয়কেই প্রণাম করিলেন এবং লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু বাবুদিগের মুখের দিকে চাহিয়াই দুঃখিনী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা অতি ভদ্র এবং দয়ালু। বাবুরা সমস্ত ছেলেকেই দুই একটী পড়া জিজ্ঞাসা করিলেন; দুঃখিনীকেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দুঃখিনী গৃহস্থের মেয়ে বটে কিন্তু যখন বড় দয়ার স্বরে বাবুরা তাঁহাকে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন তখন তাঁহার প্রাণের মধ্যে কেমন এক মধুর ভাব উপস্থিত হইল; তিনি ধীরে ধীরে নিজের সমস্ত দুঃখের কথা খুলিয়া বলিলেন; কেবল রমানাথের ব্যবহারের কথা বলিলেন না। দুঃখিনী যখন রসিকের কথা বলিতে লাগিলেন, সে সময়ে ডেপুটী বাবুর চক্ষু দিয়া ঝরঝর ধারে জল পড়িতে লাগিল; সত্য সত্যই বাবুরা কাঁদিয়া ফেলিলেন। বেলা অধিক হইতে দেখিয়া তাঁহারা বালকদিগকে তখনকার মত

যাইতে বলিলেন; দুঃখিনী বালকদিগকে অপরাহ্নকালে আসিয়া বাগান দেখাইবার কথা বলিয়া দিলেন। বাবুরা মনে করিয়াছিলেন সেই দিনই তাঁহারা ফিরিয়া যাইবেন, কিন্তু বাগানের শোভা না দেখিয়া তাঁহারা যাইতে পারিলেন না; অপরাহ্নকালে বালিকা-দিগের পড়া শুনিলেন, সেলাইয়ের কাজ দেখিলেন। দুঃখিনী নিজে অতি সুন্দর কয়েকটী পীরাণ সেলাই করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং দুইখানি আসনও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি বাবুদ্বয়কে তাহা দিলেন; বাবুরা মহানন্দে সেই দান গ্রহণ করিলেন। তাহার পর দুঃখিনী বালকদিগকে লইয়া বাগানে গেলেন, বাবুরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। বালকেরা নিজ নিজ জমির নিকট যাইয়া দাঁড়াইল; বাবুরা সমস্ত জমি দেখিলেন। কোন জমিতে শাক, কোন জমিতে অন্য তরকারী। দুঃখিনী সমস্ত জমি হইতেই কিছু কিছু তরকারী তুলিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাতে বাঁধিতে লাগিলেন। ডিপুটী বাবু সন্ধ্যার সময় বালকবালিকাদিগকে ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিলেন এবং দুঃখিনীকে ডাকিয়া বলিলেন "মা দুঃখিনি! তোমাকে মা বলিয়া ডাকিলাম। আমি তোমাকে কি দিব, ভগবান তোমার মঙ্গল করিবেন; আমার সাধ্য নাই, তোমার পুরস্কার করি। তোমার যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা আমি করিব; গবর্ণমেণ্ট হইতে তোমার স্কুলের জন্য টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দিব। আমি তোমার একটী উপকার করিতে চাই।" এই বলিয়া রামকৃষ্ণকে দুঃখিনীর মহাজনকে ডাকিতে বলিলেন। মহাজন সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মহাজনকে ডাকিয়া বলিলেন "শুন! তুমি আর ১২ দিন পরে

আমার কাছারীতে তোমার খাতা লইয়া যাইবে, দুঃখিনীর নিকট হইতে তুমি যত টাকা পাইবে, আমি সেই দিনে তোমাকে সেই সমস্ত টাকা দিব ; দুঃখিনীর নিকট হইতে আর একটী পয়সাও লইও না" মহাজন যে আজ্ঞা বলিয়া নমস্কার করিল। দুঃখিনী অবাক্ হইলেন, বলিলেন—"দেখুন, সে যে অনেক টাকা। আপনি দিবেন কেন? আমি ত দিতে পারিব।"

ডিপুটী। তুমি আমার সন্তানের তুল্য; তোমাকে আমি আমার মেয়ের মত মনে করিতেছি। দুঃখিনী আর কথা বলিতে পারিলেন না।

ডিপুটী বাবু বলিতে লাগিলেন—"দেখ মা! তোমার যাহা যাহা দরকার হইবে আমাকে লিখিও। আর আমি তোমাকে এই দশটী টাকা দিয়া যাইতেছি, তুমি ইহার দ্বারা তোমার বাড়ীর চারি পাশে উঁচু করিয়া একটা বেড়া দেওয়াও। আমি মধ্যে মধ্যে সপরিবারে আসিয়া তোমার এখানে বাস করিব, আমার বাটীর মেয়েদের এই সমস্ত দেখাইতে হইবে। মা! আর বেলা নাই, আমরা এখন আসি। সব ইনেস্পেক্টর বাবু শীঘ্রই তোমার মাসিক সাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর করিয়া দিবেন, আমি কেলার সাহেবকেও লিখিব।"

বাবুরা গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন দুঃখিনী বলিলেন—"আমাদের ত চাকর নাই; তা আপনি যদি বলেন তবে আপনার পেয়াদার হাতে এই তরকারী গুলি দিই। আমাদের আর কি আছে।"

ডিপুটী। কেন, তুমি যে সুন্দর আসন এবং পীরাণ দিয়াছ তাহার অপেক্ষা বেশী মূল্যের জিনিষ আমার মত ডিপুটীর ভাঁণ্ডারে নাই। মা! আমার ঘরে সোনা রূপা অনেক থাকিতে পারে, কিন্তু তুমি আজ যাহা আমাকে দিলে তাহা আমার ঘরে কেন, অনেক রাজার ঘরেও নাই। মা, আমরা এ জিনিষের মূল্য কেমন করিয়া বুঝিব।

এই বলিয়া ডেপুটী বাবু তিন চারিজন চৌকীদারকে এ সকল দ্রব্য তুলিয়া লইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

ডেপুটী বাবুরা যতক্ষণ বাগান দেখিতেছিলেন ততক্ষণ সদানন্দ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিল; জেলার হাকিম, অপরিচিত লোক, দেখিয়া সে এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, কিন্তু যখন সে দেখিল হাকিম বাবু দুঃখিনীকে মা বলিয়া ডাকিলেন, আদর করিয়া কত কথা বলিলেন, তখন আর তাহার ভয় থাকিল না, সে প্রথমে গুণ গুণ করিয়া পরে উচ্চৈঃস্বরে গান ধরিল

"মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানব-জমি রইল পতিত আবাদ কোরলে
ফোলতো সোনা॥
কালী নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তসরূপ হবে না;
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া তার কাছে ত
যম ঘেসেনা।"

ডেপুটীবাবু সদানন্দের গান শুনিয়া বলিলেন "এ আবার কে?"

দুঃখিনী বলিলেন—"এ আমার সদা কাকা; সকলে পাগল বলে। সদা কাকা আমার রক্ষক।" সদানন্দ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিল—

"এসে এক রসিক পাগল
বাধালে গোল
নদের মাঝে দেখ্‌সে তোরা,
পাগলের সঙ্গে যাবো, পাগল হবো,
দেখ্‌বো রসের নব গোরা।"

ডেপুটীবাবু তখন সদানন্দকে বলিলেন—"সদানন্দ, তুমি তোমার মায়ের খবর লইয়া মধ্যে মধ্যে জেলায় যাইবে; আমার বাড়ীর সকলে তোমার গান শুনিবে।"

সদানন্দ কোন উত্তর না দিয়া গান ধরিল—

"কাজ কি আমার কাশী।
এই মায়ের পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

এই বলিয়া সে দুঃখিনীকে প্রণাম করিল; তাহার পর ডেপুটী বাবু ও সব-ইন্‌স্পেক্টর বাবুকেও প্রণাম করিল। ডেপুটী বাবুরা চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

তাহার পর অল্পদিনের মধ্যেই দুঃখিনীর বিদ্যালয়ের জন্ত মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য গবর্ণমেণ্ট হইতে মঞ্জুর হইয়া ,আসিল। মহাজনের ঋণ ডেপুটী বাবু পরিশোধ করিয়া দিয়াছিলেন; সুতরাং এখন বিদ্যালয়ের যে আয় হইতে লাগিল, তাহা দুঃখিনীর হাতে জমিতে লাগিল।

দুঃখিনী চিরদুঃখিনী—তাহার টাকার প্রয়োজন কি? সংসারের এক বন্ধন ছিল—ভাই রসিক; সে এই কয় বৎসর নিরুদ্দেশ—বাঁচিয়া আছে কিনা কে জানে! গ্রামের সকলে বলিত, রসিক বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই একবার না একবার গৃহে ফিরিত; সে যে অবস্থায় দুঃখিনীকে ফেলিয়া গিয়াছিল, তাহাতে নিতান্ত নরপিশাচ না হইলে এতদিন কেহ নিরাশ্রয়া বিধবা ভগিনীকে ভুলিয়া থাকিতে পারে না; কিন্তু দুঃখিনীর মনে হইত রসিক বাঁচিয়া আছে। রসিক নাই, এ কথা দুঃখিনী ভাবিতে পারিত না।

সদানন্দেরও বিশ্বাস রসিক বাঁচিয়া আছে। সে যখন তখনই বলিত—"মা, তুই ভাবিস্ না, রসিক বেঁচে আছে। একদিন সে বাড়ী আস্‌বেই।" সদানন্দের এই কথা দুঃখিনীর নিকট দৈববাণী বলিয়া মনে হইত, তিনি রসিকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া দিন কাটাইতেন। প্রতিদিন প্রাতঃকালেই তিনি মনে করিতেন

'আজ রসিক আসিবে।' সন্ধ্যার সময় যখন তিনি দেখিতেন রসিক আসিল না, তখন তিনি কাতর হৃদয়ে বলিতেন "সদা কাকা, কৈ রসিক ত এল না?" সদানন্দ তখন কাতরকণ্ঠে গান করিত—

"আসার আশায় দীন দরদি!
আমি আর কতদিন রবো।"

এদিকে একদিন ডেপুটী বাবু সদর হইতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, বিদ্যালয়-বিভাগের ইনস্পেক্টর সাহেব অতি সত্বর মহকুমায় আসিতেছেন, তিনি দুঃখিনীর বিদ্যালয় পরিদর্শনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া দুঃখিনী ভয়ে আড়ষ্ট হইলেন। ডেপুটী বাবু বাঙ্গালী ভদ্রলোক, সদাশয় ব্যক্তি, তাঁহার সম্মুখে দুঃখিনী বাহির হইতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু সাহেবের সম্মুখে তিনি কেমন করিয়া যাইবেন। দুঃখিনী সেই কথা ডেপুটী বাবুকে বলিয়া পাঠাইলেন; ডেপুটী বাবু তাহার উত্তর পাঠাইলেন যে, 'দুঃখিনীর কোন ভয় নাই, ইনস্পেক্টর সাহেব যেদিন মহেন্দ্রপুরে যাইবেন, ডেপুটী বাবু তাঁহার সঙ্গে যাইবেন এবং যাহা বলিতে কহিতে হয়, তিনিই করিবেন। দুঃখিনী আশ্বস্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি ভাবনা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সদানন্দ যখন শুনিল যে, সাহেব দুঃখিনীর স্কুল দেখিতে আসিবেন, তখন সে বলিল "মা, ভয় কি? আমি সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সওয়ালজবাব করিব। আর সাহেবকে এমন গান শুনাইয়া দিব যে, তাহার আর কথা বলিতে হইবে না।"

দুঃখিনী।

যথা সময়ে ডেপুটী বাবুকে সঙ্গে লইয়া ইনস্পেক্টর সাহেব মহেন্দ্রপুরে আসিলেন। তিনি বালকবালিকাদিগের পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর ডেপুটী বাবু যখন ইনস্পেক্টর সাহেবকে লইয়া বাগান দেখাইলেন, তখন সাহেব একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন "আমি আজ ১৭ বৎসর ভারতবর্ষে আসিয়াছি; এই ১৭ বৎসর আমি শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিতেছি; কিন্তু এমন দৃশ্য কখনও দেখি নাই। শিক্ষা-প্রদানের এমন সুন্দর পণ্ডিতও আমি এদেশে কোন স্থানে দেখি নাই। এই প্রণালীতে শিক্ষাদানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।"

তাহার পর ইনস্পেক্টর সাহেব একটি প্রস্তাব করিলেন; তিনি বলিলেন "বিলাত অঞ্চলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এক স্কুলে পড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু এদেশে এ ভাবে শিক্ষাদান কর্ত্তব্য কিনা তাহা আমি এখনও স্থির করিতে পারি নাই। আমার মত এই যে, ছেলেদের জন্য স্বতন্ত্র একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হউক এবং মেয়েদের জন্য আর একটি বিদ্যালয় হউক। যদি শিক্ষয়িত্রী মহাশয়ের ইহাতে আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে পৃথক পৃথক বিদ্যালয়-গৃহ নির্ম্মাণের ব্যয় আমি সরকার হইতে দিতে প্রস্তুত আছি এবং বিদ্যালয়ের জন্য যে মাসিক ১৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা বালক বিদ্যালয়ের জন্য থাকুক, বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৩০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুরের জন্য সরকারে পত্র লিখিব এবং আমার বিশ্বাস আমি এ সাহায্য আদায় করিয়া দিতে পারিব।"

ডেপুটী বাবু এই কথা দুঃখিনীকে বলিলে, দুঃখিনী আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন। এ দিকে গ্রামের যে সমস্ত লোক সেইস্থানে সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন যে, গ্রাম হইতে গৃহনির্ম্মাণ সম্বন্ধে যাহা কিছু দিতে হইবে, এমন কি মজুরের বেতন পর্য্যন্ত সরকার হইতে দিতে হইবে না, গ্রামের লোকেরাই সমস্ত করিয়া দিবে; তবে তাহাদের একটা নিবেদন আছে যে, এই দুইটি বিদ্যালয়েরই "দুঃখিনী-বিদ্যালয়" নামকরণ হইবে, ইনস্পেক্টর সাহেব বিশেষ আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

তাহার পর দুই মাসের মধ্যেই দুঃখিনীর বাড়ীর সম্মুখে রাস্তার অপর পার্শ্বে বালক-বিদ্যালয় নির্ম্মিত হইল; দুঃখিনীর বাড়ীর এক পার্শ্বেই বালিকা-বিদ্যালয়ও নির্ম্মিত হইল। বালক-বিদ্যালয়ের জন্য দুইজন শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন; বালিকা-বিদ্যালয় দুঃখিনীরই হাতে রহিল, শিক্ষক মহাশয়েরা দুঃখিনীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্য্য করিতেন না।

দুঃখিনীর কথা এই স্থানে শেষ করিতে পারিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাঁহার ভাই রসিকের সম্বন্ধে দুই চারিকথা না বলিলে দুঃখিনীর জীবন-কাহিনী অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়।

রসিক একটা যাত্রার দলের সহিত গ্রামত্যাগ করিয়াছিল, একথা আমরা অনেক পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রসিক সেই যাত্রার দলের সহিত নানাস্থানে কিছুদিন ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিল। একবার যাত্রা উপলক্ষে সে ময়মনসিংহ জেলার কোন গ্রামে গমন করিয়াছিল, সেখানে গান শেষ হইলে অধিকারী মহাশয় যখন গৃহস্বামীর

নিকট বিদায় লইবার জন্য তাঁহার বৈঠকখানায় গমন করেন, তখন রসিকও অধিকারীর সঙ্গে গিয়াছিল। বৈঠকখানার যে পার্শ্বে অধিকারী ও রসিক আসন গ্রহণ করিয়াছিল, সেইস্থানে ফরাসের উপর একটা সোণার ডিবা পড়িয়াছিল, রসিক লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেই ডিবাটী চুরী করে। অধিকারী ও রসিক বৈঠকখানা হইতে বাহির হইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরেই ডিবার সন্ধান হয়, তখন সকলেই মনে করিল যাত্রার দলের লোকেরাই ডিবা চুরী করিয়াছে। ভদ্রলোকের ভৃত্যেরা তখন যাত্রাওয়ালা-দিগের বাসায় গমন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, রসিকের নিকট হইতে ডিবাটি বাহির হইল। অধিকারী মহাশয় রাগে অধীর হইয়া রসিককে তখনই পুলিশে দিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; কিন্তু যে ভদ্রলোকের দ্রব্যটি অপহৃত হইয়াছিল, তিনি রসিকের বয়স অল্প দেখিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তখন যাত্রার দলের লোকেরা রসিককে যথেষ্ট প্রহার প্রদানপূর্ব্বক তাড়াইয়া দিল।

মাতালই হউক, আর গাঁজাখোরই হউক ভদ্রলোকের ছেলে ত বটে, একটু লেখাপড়াও শিখিয়াছিল; সুতরাং এইভাবে প্রহৃত ও অবমানিত হইয়া রসিকের হৃদয়ে বড়ই ব্যথা লাগিল। ভগবান কখন কেমন করিয়া কাহাকে কোন্ পথে লইয়া যান তাহা আমরা, অল্পবুদ্ধি মানুষ, কেমন করিয়া বুঝিব। রসিক যাত্রার দল হইতে বাহির হইয়া গ্রামপ্রান্তে এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। এতদিন সে যেকথা ভাবে নাই, আজ সেই কথা তাহার মনে

হইল। পিতার কথা, স্নেহময়ী অনাথিনী ভগিনীর কথা এতদিন পরে তাহার মনে হইল; বালক অনেকক্ষণ বসিয়া কাঁদিল; ক্রমে তাহার হৃদয় শান্ত হইল, তাহার মনে বল আসিল।

সে সেই রাত্রিতেই গ্রামত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। দুইদিন চলিয়া অবশেষে সে ময়মনসিংহ সহরে উপস্থিত হইল; কিন্তু এই অপরিচিত স্থানে সে কোথায় যায়। দুইদিনের অনাহারে বালক রসিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর চলিবার শক্তি ছিল না। সে রাস্তার পার্শ্বে একটি বৃক্ষতলে বসিল, শেষে শয়ন করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই নিদ্রাভিভূত হইল।

কতলোক পথ দিয়া চলিয়া গেল, কেহই রসিকের দিকে ফিরিয়া চাহিল না। অবশেষে কাছারীর পোষাক-পরিহিত একটি বৃদ্ধ ঐ পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, একটি বালক বৃক্ষতলে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হইল। বৃদ্ধ ময়মনসিংহের কালেক্টরীর নাজির। তিনি বালককে ডাকিলেন, রসিকের তখন নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, একটি বৃদ্ধ তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। বৃদ্ধ তখন রসিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিক যখন অকপটে তাহার জীবনের কথা বলিতে আরম্ভ করিল, তখন বৃদ্ধ তাহাকে বাধা দিয়া বলিলেন "আর শুনিয়া কাজ নাই, তুমি আমার সঙ্গে এস।" রসিক অকূলে কূল পাইল; সে বৃদ্ধ নাজির বাবুর সহিত তাঁহার বাসায় গেল।

নাজির বাবু দুই চারিদিনের মধ্যেই বুঝিতে পারিলেন যে,

রসিক পূর্ব্বে যাহাই করুক না কেন, এখন সে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। তিনি তখন তাহাকে আদালতে লইয়া গিয়া কাজকর্ম্ম শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। রসিকও বিশেষ যত্নের সহিত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিল। এক বৎসর পরেই রসিকের ২০৲ টাকা বেতনের একটি চাকুরী হইল।

ইতিমধ্যে একদিন তাহারই দেশের একটি লোকের সহিত রসিকের ময়মনসিংহে সাক্ষাৎ হইল। এই লোকটী যে দুঃখিনীর দেবর রমানাথের দেশের লোক রসিক তাহা জানিত না। রসিক তাহাকে বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলে সেই পাষণ্ড তাহাকে বলিল যে, তাহার ভগিনী কুলত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এই কথা শুনিয়া রসিক মনে বড়ই ব্যাথা পাইল, সে বাড়ী যাওয়ার বাসনা একেবারে ত্যাগ করিল। কাহার জন্য সে দেশে যাইবে? অতঃপর কেহ তাহার আত্মীয়স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত, এ জগতে তাহার কেহই নাই। এই কারণেই রসিক বাড়ীতে যায় নাই বা দেশের কোন সংবাদ লয় নাই।

এদিকে যে ডেপুটী বাবুর অনুগ্রহে দুঃখিনীর দুঃখ দূর হইয়াছিল, তিনি বদলী হইয়া ময়মনসিংহের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। ময়মনসিংহে তাঁহার উপর কালেক্টরীর ভার পড়িল। রসিকও কালেক্টরীতেই চাকুরী করিত।

একদিন রসিক কতকগুলি কাগজপত্র স্বাক্ষর করাইবার জন্য ডেপুটী বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। ডেপুটী বাবুর হাতে তখন অধিক কাজ ছিল না; তিনি রসিককে দেখিয়া তাহার পরিচয়

জিজ্ঞাসা করিলেন। রসিক তাহার নাম, পিতার নাম, বাসস্থানের কথা ডেপুটী বাবুকে বলিল। ডেপুটী বাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আর কে আছে?" রসিক বলিল "এ সংসারে আমার আপনার বলিবার কেহ নাই।" ডেপুটী বাবু অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর রসিক যখন কার্য্য শেষ করিয়া গমনোন্মুখ হইল, তখন ডেপুটী বাবু বলিলেন "দেখ বাবু, তুমি আজ সন্ধ্যার পর একবার আমার বাসায় যাইও।" রসিক "যে আজ্ঞা" বলিয়া নমস্কারপূর্ব্বক চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পর রসিক ডেপুটী বাবুর বাসায় উপস্থিত হইলে, ডেপুটী বাবু দুঃখিনীর কথা পাড়িলেন। তিনি যখন দুঃখিনীর গুণবর্ণনা করিতে লাগিলেন, তখন রসিক আর স্থির থাকিতে পারিল না, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সে তখন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা ডেপুটী বাবুর নিকট নিবেদন করিল। ডেপুটী বাবু বলিলেন "রসিক, তোমার কোন অপরাধ নাই; ঐ প্রকারের কথা শুনিলে আমরাও তোমারই মত কাজ করিতাম। যাহা হইবার হইয়াছে; আগামী কল্যই তুমি কালেক্টর সাহেবকে বরাবর একখানি ছুটীর দরখাস্ত লিখিয়া আমার নিকট দিও, আমি সাহেবকে বলিয়া তোমার দুই মাসের ছুটী মঞ্জুর করাইয়া দিব। ছুটীর শেষে দুঃখিনীকে এখানে লইয়া আসিও।" তাহার পর পরম সমাদরে রসিককে আহারাদি করাইয়া বিদায় দিলেন।

রসিকের ছুটী মঞ্জুর হইল। পাঁচ বৎসর পরে রসিক বাড়ী

চলিল। একদিন অপরাহ্নকালে রসিক গৃহে উপস্থিত হইয়া ডাকিল "দিদি!"

দুঃখিনী তখন বাড়ীতেই ছিলেন। এতকাল পরে "দিদি" সম্বোধন শুনিয়া দুঃখিনী তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখেন, সম্মুখে রসিক দাঁড়াইয়া আছে। তখন আর তাঁহার কথা বলিবার শক্তি রহিল না; তিনি দৌড়াইয়া গিয়া রসিককে কোলের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন।

সদানন্দ দাবায় বসিয়া এই দৃশ্য দেখিতেছিল, সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, একলম্ফে প্রাঙ্গণে নামিয়া গান ধরিল—

"তুই কি ঘরে এলিরে রামধন।"

তাহার পর। তাহার পর আর কি। হারানিধি ঘরে আসিল। দুই মাসের মধ্যেই দুঃখিনী একটী সর্ব্বসুলক্ষণা মেয়ে দেখিয়া রসিকের বিবাহ দিলেন। বিবাহ শেষ হইলে ডেপুটী বাবুর অনুরোধ জানাইয়া রসিক দুঃখিনীকে ময়মনসিংহে যাইবার জন্ম অনুরোধ করিল; দুঃখিনী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন "ভাই, আমার সংসারের কাজ শেষ হইয়াছে; আমি জীবনের অবশিষ্ট কয়টী দিন কাশীতে বাস করিতে চাই।"

নিকটেই সদানন্দ দাঁড়াইয়াছিল, সে তখন গাহিয়া উঠিল—

"কাজ কি আমার কাশী,
ঐ মায়ের পদ-কোকনদ তীর্থ রাশিরাশি।"

কিন্তু সদানন্দের কথা রহিল না। দুঃখিনীর কাশীবাসই

স্থির হইল। বিদ্যালয়ের সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া সদানন্দকে সঙ্গে লইয়া দুঃখিনী কাশীযাত্রার উদ্যোগ করিলেন। সদানন্দ মহেন্দ্রপুর-ত্যাগের পূর্ব্বে দুইদিন ভরিয়া কেবলই ছুটিয়া বেড়ায় আর গায়—

"ওরে, কাজ কি আমার কাশী।
ঐ যে মায়ের পদ-কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।"

PUBLIC LIBRARY

সমাপ্ত।